রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য

মানবেন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য

Manabendra Bandyopadhyaya

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার / কলকাতা ৬

শ্রী দিলীপকুমার গুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই আলোচনাগুলির উপলক্ষ রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী, রচনাকাল ১৩৬৭-৬৮। এদের সূত্রপাত হয়েছিলো বিচ্ছিন্নভাবে, বিভিন্ন সাময়িকপত্রের রবীন্দ্রসংখ্যার জন্ম — কোনো অখণ্ড গ্রন্থের অংশ হিশেবে নয়। লেখাগুলি বেরিয়েছিলো 'দেশ', 'নতুন সাহিত্য', 'পূর্বপত্র' ও 'গল্পভারতী'তে— শুধু লোকসাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাটি, তখন রচিত হ'লেও, কোথাও বেরোয়নি, একবার শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের একটি আলোচনাচক্রে পঠিত হয়েছিলো।

বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পিত হ'লেও বিষয়সূত্রের সংলগ্নতার জন্য কোথাও-কোথাও তাই পুনরাবৃত্তির দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি; যদিও এখনও গ্রন্থভুক্ত করার সময় যতদূর সম্ভব পৌনঃপুনিকতা দূর করার চেষ্টা করেছি। পুরোনো লেখা সব সময়েই মনে হয় মার্জনা- ও সংশোধন-সাপেক্ষ, বয়স- ও অভিজ্ঞতা-ক্রমেই লেখকের রচনাশক্তি স্বাবলম্বী হয়। সেইজন্যই লেখাগুলি অল্পবিস্তর সংশোধন করলেও তখনকার রচনাভঙ্গি ও মুদ্রাদোষ একেবারে উড়িয়ে দেয়া অনুচিত মনে হ'লো। সত্যি-যে, আজকে এ-বিষয়ে লিখতে বসলে পুরো ব্যাপারটাকেই আমি অন্যভাবে সাজাতুম; বক্তব্য বিষয়ের অবশ্য বিশেষ বদল হ'তো না, কেননা বক্তব্য বিষয় শুদ্ধ যদি পালটে যেতো তাহ'লে এখন এ-বই ছাপাতুমই না।

বইটি যে শেষ পর্যন্ত বেরুতে পারলো তা শুধু শ্রী স্বপন মজুমদারের তাগিদে ও আগ্রহে। শ্রী নির্মাল্য আচার্য ও শ্রী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্য ক'রে মুদ্রণকার্য ত্বরান্বিত করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

২২ ফাল্গুন ১৩৭৬। কলকাতা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
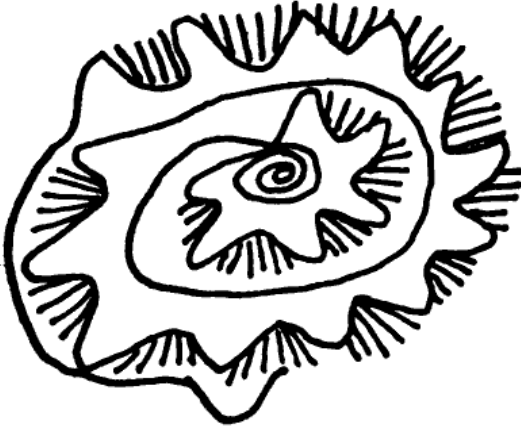
সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ-জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন। শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদবশত সে রসসকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। —ছেলেভুলানো ছড়া : ২ / লোকসাহিত্য

১

কথাটা একটু খুলিয়া না বলিলে ছড়া-সংগ্রহের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিছুদিন হইতে অনন্যসাধারণ প্রতিভায় অলঙ্কৃত পরম শ্রদ্ধাস্পদ্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক এই জাতীয় কবিতা সংগ্রহের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি প্রকাশ্য সভায় "মেয়েলি ছড়া" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; ঐ প্রবন্ধে যে ভাবুকতা, সরলতা ও চিন্তাশীলতার সহিত এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা অন্যের পক্ষে অনুকরণের অতীত।...

রবীন্দ্রবাবু প্রবন্ধপাঠেই নিরস্ত ছিলেন না; তিনি স্বয়ং সংগ্রহ-কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন হইতে এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কি কারণে জানি না, কাজটা অধিক দূর অগ্রসর না হইয়াই থামিয়া যায়।

সম্ভবতঃ পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকসম্প্রদায় অথবা পরিষদের পরিচালকগণ ছেলে-ভুলান ছড়ার সংগ্রহ তাঁহাদের মত প্রবীণ পণ্ডিতমণ্ডলীর অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯) বইয়ের ভূমিকায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী খুব সোজাসুজি দেখিয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো লোকসাহিত্য ব্যাপারটির দিকেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম সচেতন ও সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আবিষ্কার করতে পারেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্বন্ধ কী রকম গভীর ও সচেতন ছিলো: রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে যাত্রাগানের সম্বন্ধ, রবীন্দ্রনাথের গানে বাউল ও অন্যবিধ লোকসংগীতের প্রভাব, তাঁর কবিতায় লৌকিক ছড়া ও কবিতার অভিঘাত, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পিছনে লৌকিক কারুশিল্প জিইয়ে রাখবার প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয় প্রবন্ধলেখকদের প্রিয় প্রসঙ্গ। কিন্তু লোকসাহিত্যের

প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিপুল অনুরাগ শুধু যে তাঁর নিজের শিশুসাহিত্যেরই পিছনে উদ্দীপক ভূমিকা নিয়েছিলো, তা নয়; রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও পোষকতায় বাংলা শিশুসাহিত্যের এক সোনালি যুগেরও সূচনা হয়েছিলো।

কথাটা বোধহয় একটু বিশদ করা ভালো।

এ-কথা বলতে চাচ্ছি না যে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিকগুলির দিকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রেভারেণ্ড জে.লঙ বাংলা প্রবাদের সংগ্রহ করেছিলেন আগে, বোম্পাস ও বোডিং সাঁওতাল পরগণার লোককথা সংকলন করেছিলেন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখেছিলেন *Folk-Tales of Bengal*, জি. এ. গ্রীয়ারসন তাঁর আলোচনায় গাথা বা **ballad**-এর নিদর্শন উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু প্রচেষ্টাগুলি ছিলো নিতান্তই অসংলগ্ন, ছাড়া-ছাড়া এবং ব্যক্তিগত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপে যেভাবে লোকসংস্কৃতির প্রতি সচেতন ও গোষ্ঠীবদ্ধ দৃষ্টি পড়েছিলো, উল্লিখিত প্রচেষ্টাগুলো মোটেই তেমন ছিলো না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম চেয়েছিলেন কোনো পরিষৎ বা সমিতি যাতে তাদের উদ্যম ও উদ্যোগ এই দিকে নিয়োজিত করে। তাঁর ছেলেবেলা কেটে-ছিলো হিন্দুমেলার আবহাওয়ায়, পরে যার পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা হয়েছিলো শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়। তখন থেকেই লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন শিল্পের দিকে তাঁর ঝোঁক পড়েছিলো। কিন্তু কেবল ঝোঁক প'ড়েই তা থেমে থাকেনি, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তার 'সৃষ্টিশীল অনুসন্ধান'; সেইজন্য দেখা গেলো ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তিনি অগ্রণী হিশেবে এগিয়ে এসেছেন।

'সাধনা' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১) পত্রিকায় প্রথম বেরুলো রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছড়ার প্রথম কিস্তি, সঙ্গে ভূমিকায় তিনি বললেন :

> বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।[১]

১ পরে 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে এই লেখাটি 'লোকসাহিত্য' বইয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলো।

'কিছুদিন হইতে' কথাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, কেননা ১৩০১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছড়াগুলো 'সাধনা' ও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'তে থাকে। এ-সকল ছড়ার কবিতার দিকই তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলো: তাঁর সন্দেহ ছিলো না যে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বর দিক থেকে ছড়াগুলোর মূল্য অপরিসীম, কিন্তু তিনি যেহেতু প্রথমত ও প্রধানত কবি, তাই ছড়াগুলোর অন্তবিধ মূল্য সম্বন্ধে নিঃসাড় না-থাকলেও তিনি এদের বিষয়ে কৌতূহলী ও উদ্যোগী হয়েছিলেন কবিত্বের জন্তই। আর প্রথমে সংগ্রহ করাটাই জরুরি মনে হয়েছিলো, বিবিধ সত্য ও তত্ত্ব নিষ্কাশন করার চেয়ে সেটাই মনে হয়েছিলো প্রথম কৃত্য, যদিও এই বোধ ছিলো যে 'এই সাহিত্যে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত না থাকিলেও, হয়ত দুই একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব, দুই একটা সামাজিক তত্ত্ব সঙ্গোপনে লুক্কাইত থাকিতে না পারে, এমন নহে। ভূতত্ত্ববিদেরা একখানা দাঁত বা একখানা হাড় অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের এক একটা নূতন পরিচ্ছেদ উদঘাটিত করিয়া ফেলেন। সেইরূপ ভবিষ্যতের কোন গ্রিম্ বা মোক্ষমূলার এই বাঙ্গালীর ছেলের ছেলেমি ভাণ্ডারের মধ্য হইতে দুই একটা নাম বা শব্দ বা বাক্য অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাসের কোন বিস্তৃত অধ্যায় আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন কিনা, জানি না।'[২]

রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও প্রস্তাবনায় ছড়াসংগ্রহের কাজ এগুচ্ছিলো; চট্টগ্রামের মুনশি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও বাঁকুড়ার বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বে সাহিত্য-পরিষৎ ব্রতকথা সংগ্রহ করেছিলেন, কিরণবালা দেবী মুরশিদাবাদের মেয়েলি ব্রতকথা জোগাড় করেছিলেন, দীনেশচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংকলন হচ্ছিলো; কিন্তু হঠাৎ পরিষৎ-পত্রিকার পরিচালকেরা ছেলেভোলানো ছড়ার সংগ্রহ করা তাঁদের পাণ্ডিত্যের অযোগ্য ব'লে মনে করলেন[৩], কাজটা বাতিল হ'য়ে গেলো।

তথাকথিত পণ্ডিতদের নিঃসাড় প্রতিক্রিয়া দেখে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ সম্বন্ধে

২ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : ভূমিকা ; 'খুকুমণির ছড়া', ১৬ সংস্করণ, পৃঃ [৫]
৩ তদেব, পৃঃ [৪]

পুনর্বার সঠিক ধারণা করতে পেলেন সন্দেহ নেই, আর সেই ধারণাটিও বিশেষ মনোমুগ্ধকর ছিলো না; কিন্তু নিজের দৃষ্টান্ত ও উৎসাহ দ্বারা এমন কয়েকজনকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজটি মোটেই বন্ধ হ'য়ে যায়নি। চেনাশুনো যাঁদের দিয়ে তিনি এই কাজটি করিয়েছিলেন, বা যাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যমের পিছনে তাঁর অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও সর্বান্তিক প্রীতি ছিলো, তাঁদেরই একজন যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

২

যখন প্রমাণ পাওয়া গেলো যে বয়স্ক ও প্রবীণ ব্যক্তিরা লোকসাহিত্য সম্বন্ধে বিরূপ ও নিঃসাড়, তখন দেখা গেলো যে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এ-সব ছড়া ও গল্প থেকে অন্তহীন আমোদ ও আনন্দ পাচ্ছে। আর তারই ফলে লোকসাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহের প্রধান ও কৃতজ্ঞ পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে উঠলো এই তথাকথিত অর্বাচীনেরা—অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা। ঘুরিয়ে বলতে গেলে, লোকসাহিত্যের সংগ্রহ শিশুসাহিত্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লে স্বীকৃত হ'য়ে গেলো। এটা অবশ্য সব দেশের লোকসাহিত্যের একটা বড়ো অংশের বেলায় খেটে যায়। ঘুমপাড়ানি গান, ছেলেভোলানো ছড়া, রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তি, নীতিগল্প—এগুলো, সন্দেহ নেই, সব দেশেই শিশুসাহিত্যের বুনিয়াদ ব'লে স্বীকৃত হ'য়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় এটা যে প্রায় 'কেবলমাত্র শিশুতোষ' সাহিত্য হিশেবে গণ্য হয়েছিলো, এই কথাই এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হবার আগে বাংলা শিশুসাহিত্যের একটা মস্ত অংশই ছিলো বিদেশী কেতাবের তর্জমা—প্রধান প্রকাশক ছিলেন স্কুল বুক সোসাইটি। এ-সব অনুবাদ বা ছায়ানুসারী রচনার অধিকাংশই ছিলো পাণ্ডিত্যপ্রবণ, উপদেষ্টা, তথ্যভারাক্রান্ত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাতে ছিলো 'বুদ্‌বুধিদের হিদ্‌হিদ্‌হিদিক্কার'—আনন্দের উপকরণ তাতে ছিলো যৎসামান্য। আর ছিলো নীতিকথা-লোককথার অনুবাদ বা পুনর্লেখন—ছিলো হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রর তর্জমা, ঈশপের কথামালা, ক্রিলফের নীতিগল্প, মাইকেল মধুসূদন কবিতাতেই লা ফঁতানের নীতিকাহিনী অনুবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন, ভারনাকুলার

লিটারেচার সোসাইটি মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে হান্স আণ্ডেরসেনের রূপকথা বার করেছিলেন – হান্স আণ্ডেরসেন তখনও বেঁচে।[৪]

'বালক' আর 'মুকুল' যখন বেরুলো, তখন অবস্থা পরিবর্তমান। এবং এই শিশুপত্রিকাগুলির উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'মুকুল' পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী দেশী-বিদেশী রূপকথার পুনর্কথন করলেন, 'বালক'-এ বেরুলো জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নাট্যরূপ-দেয়া বাংলাদেশের দুটি রূপকথা: 'টাকডুমাডুম' ও 'সাতভাই চম্পা'। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ কলম ধরলেন, বেরুলো 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬), 'বুড়ো আংলা' (১৩২৭), 'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৯২৫)। 'ক্ষীরের পুতুল'-এর মধ্যেই ষষ্ঠীতলার দিব্যদৃষ্টির মধ্যে ছড়ায় ও গানে আবহমানের বাংলাদেশ জীবন্ত ও স্পন্দমান হ'য়ে উঠলো। তার আগেই বেরিয়েছিলো স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গল্পস্বল্প' (১৮৯২); আরো আগে 'অরুণোদয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো 'বঙ্গীয় উপকথা'। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৮৬৬ – ১৯৩৭) 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১), 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯), 'ছড়া ও পড়া' (১৯২১), 'ছোটদের উপকথা' (?) বেরুলো পর-পর, বেরুলো আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-সংকলিত 'ছেলে ভুলান ছড়া' (১৮৯৯) বেরুলো উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩ – ১৯১৫) 'টুনটুনির বই' (১৯১০), ভূমিকায় লেখা:

> সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না। আশা করি আমার সুকুমার পাঠক-পাঠিকাদেরও এই গল্পগুলি ভালো লাগিবে।

ওই সময় থেকেই শিশুসাহিত্যের অনেক লেখকের চেষ্টায় ও উদ্যোগে দেশ-বিদেশের উপকথা সংগ্রহ করবার ঝোঁক দেখা যেতে লাগলো – আর লক্ষণীয় যেটা, এঁদের প্রায় সকলেরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও কারু-কারু

৪ মধুসূদন মুখোপাধ্যায়-অনূদিত গল্পগুলোর নাম: চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিবরণ, ছোট কৈলাশ বড় কৈলাশ, মারমেড অর্থাৎ মৎস্যনারীর উপাখ্যান, কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার বিবরণ, বায়ুচতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা, হংসরূপি রাজপুত্র, চকমকি বাক্স ও অপূর্ব বস্ত্র।

সঙ্গে বা আত্মীয়তাসম্বন্ধও ছিলো। আমরা যদি তখনকার বিভিন্ন বইয়ের একটি অসংলগ্ন ও এলোমেলো তালিকা তৈরি করবার চেষ্টা করি তাহ'লেই এ-তথ্য স্পষ্ট ধরা পড়বে। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে বেরিয়েছে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'ডালি', সীতা দেবী শান্তা দেবী তর্জমা করেছেন 'হিন্দুস্থানী উপকথা' (১৯১২) ও 'নিরেটগুরুর কাহিনী' (১৯১৩) যার ছবি এঁকেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর; শান্তা দেবী আঙ্কল রেমাসের গল্পগুলো অনুবাদ করেছেন 'হুক্কাহুয়া' (১৯১৯); সুখলতা রাও বিদেশী লোককথা তর্জমা শুরু ক'রে দিয়েছেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত জাপানি রূপকথার পুনর্লেখনগুলি বেরুতে শুরু করেছে: 'কল্পকথা' (১৯০৯), 'জাপানী ফানুস' (১৯১৪), 'ঝুমঝুমি' (১৯২০); বেরিয়েছে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাতের জন্মকথা' (?); নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সংগ্রহ করছেন সাঁওতালি উপকথা: 'ব্যাঙের আত্মকথা' (১৯১৯), 'উদোলবুড়োর সাঁওতালি গল্প' (১৯২১), 'উদোলবুড়োর আরো গল্প' (১৯২১); ললিতমোহন ভট্টাচার্য সংকলন করেছেন বাংলার রূপকথা, 'পঞ্চরঙ' (১৯১৩); অসিতকুমার হালদার সংগ্রহ করেছেন 'হো-দের গল্প' (১৯২১), বোগ্‌দাদি কাহিনী 'বুনোগপ্‌প' (১৯২১), আর চীনের রূপকথা 'পাথুরে বাঁদর রামদাস ও কয়েকটি গল্প' (১৯২৮); রবীন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন 'অচিন দেশের রাজপুরী' (১৯২৬), 'কালু সর্দার' (১৯২৯), 'আলোর পাহাড়' (১৯২৯); বিভূতিভূষণ গুপ্ত সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশের উপকথা 'বেড়াল ঠাকুরঝি' (১৯২৩) ও 'কাঠবেড়ালী ভাই' (১৯৩১)। এই তালিকাটি বিশৃঙ্খল ও অসম্পূর্ণ—তবু কিন্তু এ থেকেও তখনকার শিশুসাহিত্যের আবহাওয়াটি একটু-একটু বোঝা যায় নিশ্চয়ই। ততদিনে বেরিয়ে গেছে 'সন্দেশ', এমনকি 'মৌচাক' পর্যন্ত। কিন্তু আমি যেদিকটায় জোর দিতে চাই, তা এই: রূপকথা-উপকথা ছড়া ও গান সংগ্রহর দিকে শিশুসাহিত্যের এই ঝোঁকটি কেবল রূপকথার কাল্পনিক জগতের প্রতি শিশুদের স্বাভাবিক টান থেকেই সৃষ্টি হয়নি—এর পিছনে রবীন্দ্রনাথের একটি মস্ত ভূমিকা ছিলো। অনেক সময়েই তা ছিলো হয়তো নীরব, কখনো বা মৌখিক—কিন্তু আবার যদি আমরা শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফিরে যাই, তাহ'লে দেখতে পাবো একটি লিখিত দলিল—দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের (১৮৭৭—১৯৫৭) 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র (১৯০৭) অবিস্মরণীয় ভূমিকা, যা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং:

ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিষ আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের "Fairy Tales" আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে'। তাঁহাদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোনো কোনো স্থলে মার্টিনের এথিক্‌স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল—রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র কোথায় বেঙ্গমাবেঙ্গমী, কোথায়—সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক!

পাল পার্ব্বণ যাত্রা গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তার পরে দেশের শিশুরাও কোন্ পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল! তাহাদের স্বায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসীন-দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবলি বিলাতী বানান-বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে!

কেবলি বইয়ের কথা! স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল!—দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায়!

এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্য্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুম পাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

অতএব বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।

দক্ষিণারঞ্জনবাবুর ঠাকুরমা'র ঝুলি বইখানি পাইয়া তাহা খুলিতে ভয় হইতেছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক কলমের কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা পাছে বাদ পড়ে। এখনকার কেতাবী ভাষায় ঐ সুরটি বজায় রাখা বড় শক্ত—আমি হইলে ত এ কাজে সাহসই করিতাম না। ইতিপূর্ব্বে

কোনো কোনো গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিত মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু হোক মেয়েলি হাত, তবুও বিলাতী কলমের যাদুতে রূপকথায় কথাটুকু থাকিলেও সেই রূপটি থাকে না; সেই চিরকালের সামগ্রী এখনকার কালের হইয়া উঠে।

কিন্তু দক্ষিণাবাবুকে ধন্য। তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলা দেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু-শয়ন-রাজ্যে পুনর্ব্বার তাঁহারা নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন।

'ঠাকুরমা'র ঝুলি'-র এই ভূমিকার একটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ব'লে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ যে অনেককে দিয়েই বাংলা দেশের রূপকথাগুলি লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, তার পক্ষে আরো-একটি প্রমাণ: 'ইতিপূর্ব্বে কোনো কোনো গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি।' কিন্তু তিনি এ-বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে শুধু গল্প বললেই হবে না, লেখার ভঙ্গি, ভাষা, অন্তর্লীন তাৎপর্য— সবই অবিকল ধ'রে-রাখা জরুরি। অর্থাৎ সমালোচকের ভূমিকাও তিনিই নিয়েছিলেন: 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধের দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া উচিত। সত্যি, রবীন্দ্রনাথ নৃতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিকের কৌতূহল নিয়ে বাংলা দেশের এই বুকের কথাগুলিকে ধ'রে রাখতে চাচ্ছিলেন না—তিনি তাদের কল্পনার দিক সম্বন্ধেই স্পর্শাতুরভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। আর ছড়ার ছন্দের অফুরন্ত শক্তি সম্বন্ধেও তিনি সৃষ্টিশীলভাবে সচেতন হ'য়ে উঠছিলেন—'ছন্দ' বইতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত উৎকলিত হয়েছে যা সরাসরি বাংলাদেশের এই ঘুমপাড়ানি ছেলেভোলানি ছড়াগুলোকে মনে করিয়ে দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমের এমন-অনেক সাহিত্যিকের দেখা পাওয়া যাবে, যাঁরা কেবল সাহিত্য হিশেবেই লোককথা ও রূপকথা সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এলোমেলোভাবে হান্স আণ্ডেরসেন, লেভ তলস্তয়, ডাবলিউ.

বি. ইয়েটস, সেলমা লাগেরলোফ প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁরা গ্রিমভ্রাতাদের মতো ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না, লিনিয়াস-হেজেলিয়াস-এর মতো নৃতাত্ত্বিক ছিলেন না, ই. ডাবলিউ. ব্র্যাবরুক বা সিসিল শার্পের মতো সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না—কিন্তু তবু এই ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কম মূল্যবান নয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরো এগিয়ে গিয়ে বলা যায় যে তিনি যে নিজেই কেবল এ-সব ছড়া ও গল্প সংগ্রহ করেছিলেন তা নয়, মুষ্টিমেয় হ'লেও আরো অনেককেই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সৃষ্টিশীলভাবে কৌতূহলী ও উৎসুক ক'রে তুলেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, কেউ যদি লোককথা অবলম্বন ক'রে কোনো কাহিনী বা রচনা প্রকাশ করতেন, তাহ'লে তিনি নিজেই প্রথম তার প্রশংসামুখর সমালোচনা করবার জন্য এগিয়ে আসতেন। এই জন্যই 'সাধনা'য় (ফাল্গুন ১২৯৯) রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'র উদ্দীপক সমালোচনা লিখেছিলেন, আর-কারু উপর সমালোচনার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেননি :

> এই উপন্যাসটি ("কঙ্কাবতী") মোটের উপর যে আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম, কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসংগত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।
>
> কিন্তু লেখক যে তাঁহার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশকে রোগশয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে এমন কোনো অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা

করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্ত্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকার স্বপ্নের আয়ত্তগম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্দ্ধরাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমত করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে "অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" নামক একটি ইংরাজী গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব, অবাস্তব, কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্ত্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে-পড়িতে আমরা এই সমস্ত ক্রটী মার্জ্জনা করিয়াছি। এবং আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালকবালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরল গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্প-লোকই লিখিতে পারেন। তাহার একটা কারণ, আমরা জাতটা কিছু স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলেমানুষি মনে করি; সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষি আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা ছেলেদের খেলাধুলা গোলমাল প্রায়ই ধমক দিয়া বন্ধ করি, তাহাদের বাল্য উচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিই, তাহাদিগকে ইস্কুলের পড়ায় ক্রমিক নিযুক্ত রাখিতে চাহি, এবং যে ছেলের মুখে একটি কথা ও চক্ষে পলকপাত ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনো প্রকার গতি নাই, তাহাকেই শিষ্ট ছেলে বলিয়া প্রশংসা করি। আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষি বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার তো কথাই নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি উপদেশ দিই। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর, লেখারও তেমনি সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সকল প্রকার কার্য্যানুষ্ঠানে পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ কৌতুক-পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তরুণতা। এইজন্য তাহাদের সাহিত্যে ছেলেদের বই এত বহুল এবং এমন চমৎকার। তাহারা অনায়াসে ছেলে হইয়া ছেলেদের মনোহরণ করিতে

পারে এবং সে কার্য্যটা তাহারা অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করে না। চার্লস ল্যামের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গালায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত—তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া বলিত, হইল কি ? ইহা হইতে কি পাওয়া গেল ? ইহার তাৎপর্য্য কি, লক্ষ্য কি ? তাহারা পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ, সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায় ; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কি রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙে মুল্লুক-নিবাসী শ্রীমান্ ঘ্যাঁঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভ-বিবাহবার্ত্তা আমাদের এই দুইঠেঙো মুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠক সম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের নিবেদন এই যে, সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতিকোটী সুগম্ভীর কাঠের পুতুলের মধ্যে যদি কোনো দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্যচাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে ; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া, তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানবহৃদয়জলধির বিচিত্র উত্থান-পতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়। কখনো বাল্যের অকৃত্রিম হাস্য, কখনো যৌবনের উন্মাদ আবেগ, কখনো বার্দ্ধক্যের স্মৃতিভারাতুর চিন্তা, কখনো অকারণ উল্লাস, কখনো সকারণ তর্ক, কখনো অমূলক কল্পনা, কখনো সমূলক তত্ত্বজ্ঞান আনয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মানসিক ষড়ঋতুর প্রবাহ রক্ষা করে, তাহাকে মরিয়া যাইতে দেয় না।

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হ'লো, কারণ পুরো আলোচনাটাই এখানে তুলে দেয়া হয়েছে ; কিন্তু 'কঙ্কাবতী'র সমালোচনা ছাড়াও এর মধ্যে আরো কতগুলো কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আছে, যা এই প্রসঙ্গে আমাদের কাজে লাগবে। নিষ্ক্রিয় ও অকালবৃদ্ধ বাংলাদেশকে রবীন্দ্রনাথ যে খুব ভালো ক'রেই চিনতেন তা 'ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত

পাঠকসম্প্রদায়ের' প্রতি তীব্র টিপ্পনীতেও স্বতঃপ্রমাণ। পরে এই 'ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠক সম্প্রদায়ের' জন্যই রবীন্দ্রনাথের ঘুমপাড়ানি ছড়ার সংগ্রহকর্ম বন্ধ হ'য়ে যাবে, আমরা দেখতে পাবো। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরে একে উদ্দেশ ক'রেই সাহিত্য-পরিষৎকে খোঁচা দেবেন, 'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকায়। কিন্তু তা ছাড়াও এই আলোচনার মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের ধারণাটি বেশ ভালোভাবে ফুটে ওঠে। কৌতুকরস ও বাল্য চাপল্যের উন্মাদনা—শিশু-সাহিত্যের কাছে রবীন্দ্রনাথের একটি দাবি ছিলো এই রকম। তাই 'একটি আষাঢ়ে গল্প' (ও তার নাট্যরূপ : 'তাসের দেশ')-র মধ্যে ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত নিয়মনিষ্ঠের দেশে দক্ষিণ পবনের আনাগোনার রূপক এই বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট ক'রে তুলেছিলো। 'লিপিকা'র 'ভুলস্বর্গ'ও এখানে মনে প'ড়ে গেলে অবাক হবার কিছু নেই। শিল্পীকল্পনার সজীব দিকগুলির সঙ্গে মধ্যবিত্ত নিয়মনিষ্ঠার সংঘাত—এটা সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যেরই একটি কৌতূহলোদ্দীপক অংশ—শুধু আলাদাভাবে শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞার্থের সঙ্গে জড়ানো নয়, অবশ্যই। কিন্তু তাঁর ছোটোদের জন্য উদ্দিষ্ট রচনায় এই বিষয়টি অবিরল ও অসংবরণীয়ভাবে বার-বার দেখা দিয়েছে।

কিন্তু এই আলোচনা আপাতত জনান্তিকে হোক—পরে মুখোমুখি ও বিশদ হবে। লোকসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনারই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সম্পর্ক নির্ণয়ই এখন বরং বিবেচিত হোক। আমরা আগেই দেখিয়েছি রবীন্দ্রনাথ অনেককে দিয়ে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করিয়ে-ছিলেন, নিজেও অনেক সংগ্রহ করেছিলেন,[৫] কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু সংগ্রহ করলে তার আলোচনা করা, ভূমিকা লিখে দেয়া, বা কখনো-কখনো নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করাও তাঁর কৃত্য ছিলো। তিনিই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে যাঁর 'ক্ষীরের পুতুল' বাংলাদেশের সজীব ছড়ার মধ্যে দিয়ে চিরদিনের বাংলার শৈশবকে ফুটিয়ে তুলেছিলো। পরে—আমরা জানি—

৫ 'লোকসাহিত্য' বইটিই শুধু নয়—তা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহকর্মের নিদর্শন অনেক ; 'প্রবাসী'তে 'হারামণি' বিভাগে তিনি লালন ফকিরের গান প্রকাশ করেছিলেন, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনেও ২৯৮টি বাউল গান সংরক্ষিত আছে। আরো-একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আছে দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র (১৩১৫ ?) ভূমিকায় : 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ঠাকুরদাদার ঝুলি"র কিয়দংশ পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন।' অর্থাৎ শুধু সংগ্রহ করা নয়, অন্য সংগ্রাহকদেরও তিনি তখন নানাভাবে সাহায্য করছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রবিকা'রই আগ্রহে 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯) রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৩০৩ সালে যখন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 'মেয়েলি ব্রত' সংকলন করেন, তখন তারও ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ :

> সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।
>
> অনেকেরই নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান কালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।[৬]
>
> বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্যসম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্য্য-সকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গম্ভীর সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গ-সাহিত্য, বঙ্গদেশপ্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

ভূমিকাটি তারই মুখর সাক্ষী, যা আমরা এতক্ষণ বিবৃত করতে চাচ্ছিলাম ; কেন ছড়া ও লোককথার সংগ্রহকর্ম বাংলাদেশে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভূ'ত হ'য়ে গেলো – কীভাবে হ'লো। প্রবীণ ও প্রাজ্ঞদের তাচ্ছিল্য ও অবহেলাতেই কেবল নয় – যাঁদের রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্টত নাবালক বলেছেন – তাঁদের সক্রিয় বিরোধিতায়। কিন্তু বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সৌভাগ্যের বিষয় প্রবীণও নয়, গম্ভীরও নয় – তারা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সবকিছু সাদরে ও সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলো।

৬ এখানেও ভারিক্কি বাংলাদেশের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য টিপ্পনীটি থেকে বোঝা যায় সেই সময়ে বাংলাদেশে নিশ্চয়ই একদল 'পণ্ডিত' এ-সব সংগ্রহকর্মকে হাস্যকর ও অবান্তর ব'লে প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষে এ-রকম সাড়া দেয়ায় অস্বাভাবিক কিছু নেই, সত্যি, কিন্তু এই বিরোধিতা যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠলো, তখন তিনি 'সাধনা' ও 'সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা'য় তাঁর সংগ্রহ প্রকাশ করা থেকে বিরত হলেন। আজ জল্পনা করা যায়, কাজটা যদি সোৎসাহে সুপরিকল্পিতভাবে সমষ্টিগতভাবে এগুতো তাহ'লে আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে হয়তো সত্যিকার কাজ হ'তে পারতো।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তখনও চাচ্ছিলেন এ-সব সংগ্রহকর্মর সারবত্তা কতখানি, তা 'গম্ভীর সম্প্রদায়'কে বোঝাতে, তাই ওই ভূমিকায় তিনি আরো লিখেছিলেন :

> য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিতেছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না – দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্ব্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে – এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।
>
> সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী, আমাদের স্ত্রী কন্যা এবং সহোদরাদের কোমলহৃদয়পালিত মধুরকণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেইজন্য গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সেইসঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোন প্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না এমনও মনে করি না।
>
> এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায়[৭] মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বঙ্গদেশের জনসাধারণ প্রচলিত পার্ব্বণগুলির উজ্জ্বল এবং সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিরা সাধনাসম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশাকরি দীনেন্দ্রকুমার বাবু সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

৭ দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীচিত্র (১৯০৪), পল্লীবৈচিত্র্য (১৯০৫) ও পল্লীকথা (১৯১৭) – এই তিনটি বইয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের গ্রাম, পালাপার্বণ, নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের সজীব ও সতেজ ছবি ফুটে উঠেছিলো। কিন্তু এই বইগুলো ছাড়া কিছু-কিছু লৌকিক গল্পেরও তিনি 'পুনর্লিখিত রূপ' প্রকাশ করেছিলেন, 'তালপাতার সিপাই' (১৯২৩), 'ভূতের বোঝা' (১৯২৫) ও 'মজার কথা' (?) বই তিনটিতে। দীনেন্দ্রকুমার রায়কে সবাই চেনে বিলিতি গোয়েন্দাগল্পের অনুবাদক হিশেবে, কিন্তু তাঁর যে-রচনাগুলো এখনও কৌতূহলোদ্দীপক ও সমাদরণীয়, পরিতাপের বিষয় সেগুলো শুধু যে দুষ্প্রাপ্য তাই নয় – অনেকেই তাদের কোনো হদিশ রাখেন না।

পরে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-এর 'হারামণি'র 'আশীর্বাদ' লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ : একদিক থেকে এই কাজগুলো তাঁর কাছে ছিলো যাকে বলে নিছক বেগার খাটা ; আজকের দিনে ক-জন লেখকের কথা আমরা ভাবতে পারি যাঁরা অপরিচিত লেখকদের বইয়ের ভূমিকা লিখে দিচ্ছেন, অসংবৃত প্রশংসা করছেন, সৃজনশীল ও দায়িত্বপূর্ণ -ভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে আত্মনিয়োগ করার জন্য প্রেরণা জোগাচ্ছেন ? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ – কত তাঁর কাজ, নিজে কত-কিছু লিখেছেন রোজ, অসংবরণীয়ভাবে তাঁর সৃষ্টিচর্চা চলেছে – অথচ তারই মধ্যে তিনি ঠিক সময় পাচ্ছেন সেই কাজগুলো করবার, দেশের পণ্ডিতেরা যে-কাজকে ছেলেমানুষি ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

৩

এখানে মনে রাখতে হবে যে লোকসংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই প্রবল অনুরাগ কেবল বুদ্ধি- ও বিবেক- নির্ভর ছিলো না। ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন সঙ্গীহীন, স্পর্শাতুর, কল্পনাপ্রবণ, ফলে শৈশবের নিঃসঙ্গ দিনগুলো কল্পনায় জনপূর্ণ হ'য়ে উঠতো, সেখানকার মানুষজন রূপকথার জগৎ থেকে উঠে আসতো, একেবারে বাংলাদেশের বুকের মধ্য থেকে মুখ বাড়িয়ে দিতো :'তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হত, "যাও, খেলা করো গে।" অথচ ছেলেরা খেলায় যদি উচিতমত গোল করত তা হলে শুনতে হত, "চুপ করো।" '

> ...তখনকার পরিবারে যেমন মেয়ে আর পুরুষ ছিল দুই সীমানায় দুই দিকে, তেমনি ছিল ছোটোরা আর বড়োরা। বৈঠকখানায় ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় চলছে নাচগান, গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল ; মেয়েরা লুকনো থাকতেন ঝরোখার ও পারে চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে – সেখানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন, ফিস্‌ফিস্ করে চলত গেরস্তালির খবর। ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে – "জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে..."[৮]

কখনও এই দিনগুলিকে ভোলেননি রবীন্দ্রনাথ, তাই বারে-বারে তাঁর রচনায়

৮ ছেলেবেলা / ৪ : রবীন্দ্ররচনাবলী ; দশম খণ্ড : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃ ১৩৮

এই ছেলেবেলার স্মৃতি হানা দিয়েছে ; নানা কর্মে শশব্যস্ত, লেখনী অবিশ্রান্ত চঞ্চল, 'মানসী'-'সোনারতরী'র যুগের সেই রুদ্ধশ্বাস দিনগুলি—অথচ তারই মধ্যে নদীর মাঝখানে যেখানটা চরের মতো জেগে উঠেছে, সেখানে বোট নিয়ে এসে বাঁধতেই তাঁর মনে হ'য়ে যায় :

> এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।
> তারই মধ্যে বসে আছে শিব-সদাগর।
>
> আমি ঠিক সেই শিব-সদাগর হয়ে বসে আছি।...আজকাল শুক্লপক্ষ—খানিকটা বেড়াতে বেড়াতেই চাঁদের আলো ফুটে ওঠে, তখন চরের সীমাহীন ধূসর বালি চাঁদের আলোতে এমন একটি ছায়ারচিত কাল্পনিক আকার ধারণ করে, মনে হয়, এ যেন বাস্তবিক পৃথিবী নয়—আমারই মনের একটা অপরূপ ভাব। কোন্‌কালে ছেলেবেলায় তিনকড়িদাসীর কাছে রাত্রে মশারির মধ্যে শুয়ে রূপকথার প্রসঙ্গে একটা বর্ণনা শুনেছিলেম, "তেপান্তর মাঠ—জোচ্ছনায় ফুল ফুটে রয়েছে"—যখনি জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াই তিনকড়িদাসীর এই কথাটি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় সেই রাত্রে তিনকড়ির এই একটি কথায় আমার মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—প্রকাণ্ড মাঠ ধু ধু করছে, তারই মধ্যে ধবধবে জ্যোৎস্না হয়েছে, আর রাজপুত্র অনির্দেশ্য কারণে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে—শুনে মনটা অমনি উতলা হয়েছিল! তা ছাড়া, রাজপুত্রের ভাগ্যে প্রায়ই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা জুটত কিনা, সেটাতে মনটা আরও ক্ষুব্ধ হত। মনের ভিতরে কেমন একটা দুরাশা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বড়ো হলে এই ধরণের একটা কোনো অদ্ভুত ঘটনা আমার দ্বারাও সম্ভব এবং নানা বিঘ্নবিপদের পারে কোনো-এক জায়গায় কোনো-একটি পরমাসুন্দরীও নিতান্ত দুর্লভ না হতে পারে। জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেবেলাকার সেই মশারির ভিতরকার পুলকিত হৃদয়ের মোহ জেগে ওঠে।[৯]

বা, এমনি আরেকটি চিঠিতে :

> এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল, এবং গাছপালা কুটির সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ

৯ ছিন্নপত্রাবলী ১৮০, কলকাতা ১৩৬৭, পৃ ৩৮৭-৩৮৮

চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ—...যখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে —এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়া-মিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি বিশুদ্ধ নদীতীর—এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র একটা অসম্ভব প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এই ছোটো নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটা নদী, এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে—এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি—এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে—তার পরে হয়তো অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন আমার কথাটি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো—হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প চলছিল, সেই রূপকথার সুখদুঃখ নিয়ে কখনো হাসছিলুম কখনো কাঁদছিলুম, এখন গল্প ফুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোটো ছেলের ঘুমোবার সময়।[১০]

দেশের রূপকথা যে রবীন্দ্রনাথের রক্তের মধ্যে কীভাবে মিশে গিয়েছিলো, এই লিপিগুচ্ছ তারই নিদর্শন। পরে তাঁর নিজের লেখায় অনেক রূপকথার স্মৃতি নতুন তাৎপর্য নিয়ে জেগে উঠেছিলো: 'লিপিকা'র একাধিক রূপকথায়, 'গল্পসল্প'র দু-একটি গল্পে, 'তাসের দেশ' ইত্যাদিতে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কখনও লৌকিক কাহিনী নিয়ে তিনি রচনা করেছেন কবিতা: 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী' গ্রিমের গল্পেরই নতুন লেখন। 'সোনার তরী'র যুগ্ম-কবিতা 'নিদ্রিতা'-'সুপ্তোত্থিতা' পুরোনো লৌকিক রূপকথার মধ্যে নতুন অর্থ ও দ্যোতনা ভ'রে দিয়েছিলো। 'কে পরালে মালা?' এই প্রতিধ্বনিময় প্রশ্নটির মধ্যেই বদলে গেলো সুপ্ত-সুন্দরীর উপাখ্যান—পরে রবীন্দ্রনাথের গানে-কবিতায় যে-রাজার দেখা পাওয়া যায়, আত্মার ভিতর থেকে উত্থিত যে-বিরাট প্রতিভাস—হয়তো—কেউ ইচ্ছে করলে ভাবতেও পারেন—তার প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিলো 'সোনার তরী'র ওই যুগল কবিতায়, মুহূর্তে যে ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলো।

সত্যি যে, রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' বইতে সংগৃহীত ছড়াগুলো ছাড়া বা রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত বাউল গানের সংগ্রহ ছাড়া নিজে কখনও অবিকৃতভাবে

১০ ছিন্নপত্রাবলী ১৯, কলকাতা ১৩৬৭, পৃ ৪৯-৫০

লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেননি—কিন্তু অনেক গল্প-কবিতার এষণা (motif) নিজের লেখায় ব্যবহার করেছেন ; যখন গল্পের মধ্যে তিনি নতুন অর্থ আরোপ করতে চাননি, তখন তাকে নতুনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—যা ছিলো গল্প, তাকে রূপান্তরিত করেছেন কবিতায়: যেমন 'বিম্ববতী', যেমন 'জুতা আবিষ্কার'[১১]। কিংবা লৌকিক ছড়ায় যা ছিলো সত্যি-সত্যি শাদা-কালো তেতো-মিষ্টির তালিকা, তা রবীন্দ্রনাথেরই অবসরকালের আত্মবিনোদনে আরো কৌতুকস্নিগ্ধ হ'য়ে উঠলো : 'এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু'।

যেমন লৌকিক গল্প-কবিতার অজস্র এষণা তাঁর রচনায় ফিরে এসেছিলো, তেমনি এসেছিলো যাত্রাগানের এষণা তাঁর নাটকে, লৌকিক সুরের দোলা তাঁর গানের সুরে, বাউলদের ভাবনা তাঁর গানের বাণীতে। আর গান তো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অনেকখানিই তৈরি ক'রে দেয়। এই গানের হাতেখড়ি কীভাবে হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার একটি বিবরণ দিয়েছেন পরে :

> বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে।...বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা বোধ করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নিচের তলায়। দুই একটা নমুনা দিই—
>
> এক যে ছিল বেদের মেয়ে
> এল পাড়াতে
> সাধের উল্কি পরাতে।
> আবার উল্কি-পরা যেমন-তেমন
> লাগিয়ে দিল ভেল্কি—
> ঠাকুরঝি,
> উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি—
> ঠাকুরঝি।

১১ 'জুতা আবিষ্কার' কবিতায় হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রীর উল্লেখ আছে যারা বাংলাদেশের লৌকিক গল্পের অবিকল চরিত্র, কিন্তু জুতা আবিষ্কারের কাহিনী যে সত্যি কোনো লৌকিক গল্প তা আমার জানা ছিলো না। Edward C. Dimock (Jr) তাঁর *'Thief of Love'* গ্রন্থে এই গল্পটিকে লোকসাহিত্যের হাস্যরসের নিদর্শন হিশেবে অনুবাদ করেছেন—কিন্তু কোন উৎস থেকে পেয়ে এটিকে লৌকিক গল্প মনে হ'লো, তা তিনি উল্লেখ করেননি। 'হিংটিংছট' কবিতাতেও হবুচন্দ্র রাজার উল্লেখ আছে আর সন্দেহও নেই যে তিনি লৌকিক গল্পেরই হবুচন্দ্র রাজা—তবু স্বপ্নমঙ্গলের সেই কাহিনী গৌড়ানন্দ কবিরই ভণিত ব'লে আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি।

আরও কিছু কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে, যেমন—

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল,
ফার্সি পড়ে তাঁতি।

...

গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে হারমোনিয়ামে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধানো, তার পরে হাল্কা গোছের হিন্দিগান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর তদারক যিনি করতেন তিনি বুঝেছিলেন, ছেলেমানুষি ছেলে-দের মনের আপন জিনিস, আর ঐ হাল্কা বাংলাভাষা হিন্দিবুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তা ছাড়া এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না, আপনা-আপনি নাড়ীতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য-শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান-শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়।[১২]

'আপনা-আপনি নাড়ীতে নাচতে থাকে'—এইটেই হ'লো সার কথা। আমি যেদিকটায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিলুম যে, তা হ'লো এই—রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির সন্ধান ও চর্চা করতে যাননি নৃতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিৎ বা ভাষাতত্ত্বের গবেষকের দৃষ্টিতে—ছেলেবেলা থেকে যে-আবহাওয়ার মধ্যে তিনি বড়ো হ'য়ে উঠেছিলেন তার মধ্যেই ছিলো সব উপাদান, ছড়া, গান, গল্প—ছিলো যাত্রার আসর, হিন্দুমেলার আয়োজন, স্বদেশী সভার উন্মাদনা। কবি তিনি, বিষমভাবে পৌত্তলিক ও স্মৃতিচারী—কোনোদিনই তাই ছেলেবেলার দিনগুলিকে তিনি ভুলতে পারেননি—বরং কৃতজ্ঞভাবে চারপাশের আলোহাওয়া ছন্দ-সুর থেকে জীবনীশক্তি নিষ্কাশন ক'রে নিজেকে গ'ড়ে তুলেছিলেন; ছিলেন কবি, রোমান্টিক কবি, তাই কৃতজ্ঞ স্বীকৃতির উপায় হিশেবেই তিনি লোকসংস্কৃতির চিহ্ন ও নিদর্শন সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন—জানতেন নিদর্শনগুলি কালে মূল্যবান ব'লে গণ্য হবে, কিন্তু তাঁর নিজের সাড়া ছিলো আবেগময়, স্পর্শাতুর, সৃষ্টিব্যাকুল—অথচ দেশের নানা অংশ থেকে তাঁর চেষ্টাকে হেসে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো তখন। তাই তিনি অনেককে উৎসুক ও উৎসাহী করলেন আরব্ধ কর্ম

১২ ছেলেবেলা /৭ : রবীন্দ্ররচনাবলী ; দশম খণ্ড : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ ১৪২-১৪৩

সম্পন্ন করতে — বড়োদের জন্য নয়, ছোটোদের জন্য উদ্দিষ্ট হ'লো তাঁর সংগ্রহ — বাংলা শিশুসাহিত্যের অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার হ'য়ে রইলো সে-সব (ভাগ্যিশ ছোটোরা সম্ভ্রান্তগম্ভীর পণ্ডিতসমাজ নয় !), আর রবীন্দ্রনাথ পরে লোকসংস্কৃতির অন্য দিকগুলি টিকিয়ে রাখতে চাইলেন শ্রীনিকেতন-এর বিবিধ পল্লিচর্চায়, রবীন্দ্রসদনের নানা সংগ্রহে, আর আশি বছর বয়েসে এই কথাটি আবার সরল ও অনাড়ম্বরভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে স্বীকার ক'রে গেলেন :

> যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলা দেশের মাটি দিয়ে তৈরি।[১৩]

১৩ ছেলেবেলা/১৪ : রবীন্দ্ররচনাবলী ; দশম খণ্ড : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ ১৬১
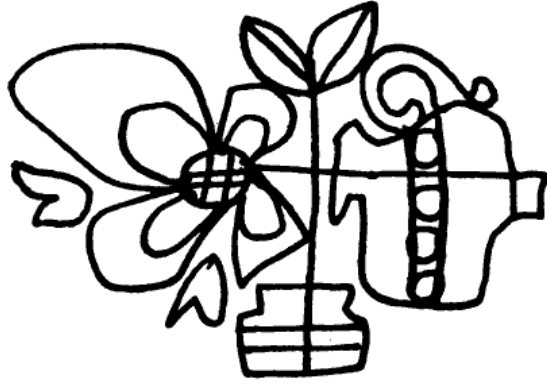
জানার সঙ্গে আধেক-জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা,
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাবনাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি,
বনের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

—বালক / ছড়ার ছবি

১

আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণ জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম; যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না—দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।[১]

এই কথা কটি এখানে এটা বোঝাবার জন্যই উদ্ধার করতে হ'লো যে রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য কোনো অনর্থক, ছেলেভুলোনো কিংবা 'বালসেব্য' ব্যাপার নয়, বিশ্বসংসারের অনেক তীব্র ও পরম উৎকাঙ্ক্ষায় ও সংঘাতে কীভাবে কোনো পরিশীলিত ও মার্জিত স্পর্শবোধ সাড়া দেয়, তারই এক ঝলমলে নজির। অন্তত মহাকবির সংবেদনা যে শিশুদের নিতান্তই অবোধ জ্ঞানে করুণা করেনি তারই প্রমাণ তাঁর ছোটোদের বই, যেখানে তিনি তাঁর জীবনের বহু বিশ্বাস, বেদনা ও অভিজ্ঞতাকে পরম সৌজন্যের সঙ্গে মহার্ঘ কোনো নৈবেদ্যের মতো চিরকালের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। শিশু রবীন্দ্রনাথের মতো ছোটোরা

১ ঘরের পড়া / জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্ররচনাবলী ; দশম খণ্ড : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ; পৃ ৫৪

তার অনেকটা বুঝবে, কিছুটা বুঝবে না—ওইভাবেই তো তা ফলপ্রসূ ও ক্রিয়াশীল হবে; জগতের শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য সাহিত্যকর্ম মাত্রেই তাই। সব রকম জলমেশানো তরলতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ তাই বারংবার স্মরণীয়।

এবং, শিশুদের প্রতি উদ্দিষ্ট তাঁর সমস্ত রচনাই এক অর্থে এই প্রতিবাদে উন্মুখর। আসলে 'সত্যিকার' ছোটোদের বই তাঁর মাত্র একটিই হয়তো: 'সহজ পাঠ'। এই অর্থে সত্যিকার যে 'সহজ পাঠ'-এ ছোটোদের দাবি একেবারে সর্বার্থসাধক; অর্থাৎ 'সহজ পাঠ' একদিকে যেমন তাদের পড়ার বই তেমনি আবার আনন্দেরও অফুরন্ত উৎস—ছন্দে-মিলে গল্পে-গানে এর মধ্যে উন্মোচিত হয়েছে বাংলাদেশ, তার জলবায়ু, ঋতুর লীলা, পালাপার্বণ ও মানুষজন—সরল ও গুঞ্জনময় একেকটি খুঁটিনাটি, স্নেহেভরা সব অনুপুঙ্খ, অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ, কল্পনায় সংক্রমিত ও উদ্বেল।

'সহজ পাঠ'[২]-এর সূচনা অ-আ-ক-খ চিনিয়ে দিয়ে, কিন্তু আস্তে-আস্তে সে দীক্ষা দেয় প্রকৃতিতে ও জীবনে—ধীরে-ধীরে গ'ড়ে ওঠে শব্দ, ছন্দ, বর্ণ, গন্ধ ও রসের জগৎ—সচকিত ও স্নেহাতুর—আর আমরা অবাক হ'য়ে দেখি ফুল কেমন ক'রে প্রজাপতি হ'য়ে যায় সংগোপনে, প্রদীপের আলো হ'য়ে যায় ছোট্ট জোনাকি, আর খালি ডাল এক রাতেই ফুলে ভ'রে ওঠে।

কিন্তু 'সহজ পাঠ' প্রকাশিত হবার আগেই বেরিয়ে গেছে 'মুকুট' আর 'রাজর্ষি', 'ব্যঙ্গকৌতুক' আর 'হাস্যকৌতুক', 'কালমৃগয়া' আর 'বাল্মীকিপ্রতিভা'; বেরিয়ে গেছে 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'তাসের দেশ', 'ঋণশোধ', 'ফাল্গুনী', 'শারদোৎসব'; বেরিয়ে গেছে 'ডাকঘর' ও 'লিপিকা', 'গল্পগুচ্ছ'-র প্রথম দুই খণ্ড; বেরিয়ে গেছে 'নদী' আর 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'শিশু' আর 'শিশু ভোলানাথ'। 'সহজ পাঠ'-এর কাছাকাছি সময়ে বেরিয়েছে 'সে', 'খাপছাড়া', 'ছড়া', 'ছড়ার বই', 'গল্পসল্প', 'ছেলেবেলা'। ছোটোদের কাছেও অফুরন্তভাবে কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক ঠেকে, এ-রকম আরো অনেক রচনা অনায়াসেই এই তালিকার অন্তর্ভূত করা যেতো, সন্দেহ নেই।

২ 'সাহিত্যচর্চা' (কলকাতা ১৩৬৮। পৃ ৬২) বইটিতে 'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন: 'যে-বয়সে ক-খ চিনলেই যথেষ্ট, সেই বয়সেই সাহিত্যরসে দীক্ষা দেয় "সহজ পাঠ": এই একটি বইয়ের জন্য বাঙালি শিশুর ভাগ্যকে জগতের ঈর্ষাযোগ্য ব'লে মনে করি।'

সত্যি যে উল্লিখিত রচনাগুলো 'কেবলমাত্র ছোটোদের প্রতিই উদ্দিষ্ট' নয় – এরা বাংলা সাহিত্যেরই এক দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন উৎসবের আনন্দময় সাক্ষী। আর সব সময়েই আছে তাঁর গান : 'কথা যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না, সুর সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যায়', গান সম্বন্ধে এই রকমই তিনি একবার নিজে বলেছিলেন।

ভাবতে ভালো লাগে, আজকের বাংলাদেশে কোনো ছোটো ছেলে এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের জগতে প্রবিষ্ট হ'তে পারে। এ-সব রচনার অনেক গূঢ় তাৎপর্যই হয়তো প্রথম প'ড়েই সে অনুধাবন করতে পারবে না, কিন্তু এ-সব রচনার কোনোটাই একবার প'ড়ে ফুরিয়ে যাবার মতো নয় – বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে-সঙ্গে সব সময়েই এরা নতুন-কিছু দেবার জন্য উন্মুখ ও প্রস্তুত – কখনো শব্দের ছন্দের রহস্যময় বিশ্বস্তর জগতে নিয়ে যাবে ভাষা, কখনো রূপায়ণের জটিল প্রক্রিয়া উন্মীলিত হ'তে থাকবে চোখের সামনে, কখনো ভাবনার সুদূরস্পর্শী বিকিরণে জীবন ও জগৎ হঠাৎ আলো হ'য়ে উঠবে। ছেলেবেলায় হয়তো এর সবটুকু বোঝা যাবে না, কিন্তু বিশ্বসংসারের যাবতীয় জটিল জিনিশের মতো এর দুর্বোধ ও রহস্যময় দিকগুলিও ছোটোদের এগিয়ে নিয়ে যাবে – অন্তত রবীন্দ্রনাথ নিজে তা বিশ্বাস করতেন। আর, সেইজন্যই, এই কথাটা এখানে উল্লেখ করা ভালো, রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য কোনো বিচ্ছিন্ন বা অসংলগ্ন বা এলেবেলে ব্যাপার নয় – তাঁর ব্যক্তিত্ব কখনোই এ-রকম ছিলো না যে নিজেকে কেটে ছেঁটে ছোটো ক'রে তিনি কারু কাছে উপস্থিত হবেন – সেটা তাঁর কাছে নিশ্চয়ই ভদ্রতার পরিপন্থী ব'লে মনে হ'তো, নিশ্চয়ই মনে হ'তো শালীনতার প্রতিকূল।

আর, এইজন্যই, রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য এক গভীর মাধুর্যের লীলায় হিল্লোলিত – আর তারই সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে কোনো নির্দেশ্য বা অনির্দেশ্য বেদনা। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের শৈশবসাধনার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই অন্তর্লীন বিষাদ। এককালে সমস্ত পৃথিবী ছিলো অধিকারে; ধাতু ধুলো হাওয়া পুতুল – সব এককালে হুকুম শুনতো আমার, এখন ক্রমেই যত বড়ো হ'য়ে গেলাম, সব ধীরে-ধীরে হারিয়ে গেলো। স্বপ্নের মধ্যে ব্যথার চাপ যেমন, এই রচনাগুলির মধ্যে সেই রকমই এক বিচ্ছেদের বোধ গুঞ্জন ক'রে উঠেছে। ছিলো দিন – সহজ, সুন্দর, বিশ্বাসনন্দিত, বিস্ময়চকিত – কিন্তু

আর কখনও সেই দিনগুলি ফিরে আসবে না ; এই বোধটাই ভিতরে-ভিতরে বিষাদ ছড়িয়ে দিয়ে যায় আমাদের মধ্যে। কিন্তু এই বিষাদ সৃষ্টিশীল, স্মৃতিজাগর, উন্মুখ ; আমাদের মনের মধ্যে ধীরে-ধীরে গ'ড়ে ওঠে স্মৃতিবিস্মৃতিবিজড়িত এক লুপ্ত জগৎ — হারানো সব নগরীর প্রতিভাস, আশ্চর্য প্রাসাদ আর জাদুর গালিচা, দূর তেপান্তর আর মস্ত রাজার বাড়ি, পাষাণের মিনার আর পক্ষিরাজের ডানা — সব ধীরে-ধীরে ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে কোনো-এক অফুরন্ত কাটিম থেকে সুতোর মতো বেরিয়ে আসে, সব জেগে ওঠে একে-একে, চাপা স্বরে কথা ব'লে ওঠে পুতুল পাখি ধাতুমূর্তি, পর্দা উঠে যায় ধুলো মাটি আর হাওয়া থেকে। পর্দা উঠে যায়, কিন্তু ভাবনা থামে না।

কে পরালো জানে না, কিন্তু তবু যেই মালা পরিয়ে দেয়া হ'লো অমনি ঘুমের দেশে ভেঙে গিয়েছিলো ঘুম, জেগে উঠেছিলো কলস্বর। 'সোনার তরী'র দুটি কবিতায় — তারা পরস্পরের সম্পূরক — এই অলৌকিক মালার কথা আছে, যা মুহূর্তে সবকিছুকে জাগিয়ে দিয়েছিলো। এই মালা — তা কি রূপকথার সেই মন্ত্র-পড়া সোনা-রুপোর কাঠিরই আরেক সংস্করণ, না কি তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু ? ভঙ্গিটি প্রচলনির্ভর রূপকথার, কিন্তু আড়ালে অনেক বেশি অমিল ; নইলে কেন সারা বেলা একেলা ও উতলা ব'সে থাকে রাজবালা, কেন তাহ'লে হাওয়া, ঋতুরঙ্গ, দিনরাত্রি সবকিছুর ভিতরে এই বিস্মিত ও বিষণ্ন প্রশ্নটি জেগে থাকে, 'কে পরালে মালা ?'

লক্ষ করার বিষয় হ'লো এই সবকিছুর উপরেই আবছাভাবে চেনা, ঘরোয়া প্রচলনির্ভরতার একটি আবরণ লুটিয়ে থাকে, যা এত সহজে ও অনায়াসে কোন সময়ে হঠাৎ অপসৃত হ'য়ে গিয়ে পাঠককে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মুখীন ক'রে দিয়ে যায় যে আমরা তা খেয়ালই করি না — শুধু হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে বিব্রত- ও অভিভূত- ভাবে সেই দিব্যদৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াই, একদা যা জগৎ পারাবারের তীরে শিশুর মহামেলা দেখেছিলো। অজস্র নিয়েছেন তিনি লোককথা আর ছেলেভোলানো ছড়া থেকে : আছে বিম্ববতীর উপাখ্যান, হবুচন্দ্র রাজা ও গোবুচন্দ্র মন্ত্রী, সুয়োরানীর সতিনবিদ্বেষ, সাতভাই চম্পা ও আরো বহু-কিছু। অধিকন্তু নানা গল্পে ও কবিতায় উল্লেখ ও উপমা হিশেবে ছড়িয়ে আছে প্রচলিত রূপকথা ও ব্রতকথার বহু অনুষঙ্গ, বহু এষণা। আছে উদাসীন, সরল এবং আপাতদৃষ্টিতে-বোকা নায়ক — শেষ অধ্যায়ে যে জয়ী

হ'য়ে যায়। নাটকে আছে জনতার দৃশ্য যা সরাসরি মনে করিয়ে দেয় গ্রামের খোলামেলা মেলার দিনের কথা। কিন্তু সব সত্ত্বেও কেমন ক'রে যেন ভোজবাজির মতো সব বদলে গিয়ে হঠাৎ নতুন হ'য়ে যায়, আর তাঁরই নামের স্বাক্ষর ছড়িয়ে পড়ে রচনাটির সর্বত্র। পুনর্কথন নয়, স্বকীয় সৃষ্টি—শুধু উপাদানগুলো অবিরলভাবে ঐতিহ্য থেকে সমাহৃত। কেমন ক'রে সব প্রচলনির্ভর উপাদান তাঁর রচনায় নতুন আয়তন, নতুন অর্থগৌরব, নতুন দীপ্তি খুঁজে পায়, তা সত্যি অভিনিবেশযোগ্য। এত সরল অনায়াস আর সহজ সেই পদ্ধতি যে পুরো রচনাটি যেন স্বচ্ছ, হালকা, নির্ভার হ'য়ে থাকে, মনে হয় যেন দেহহীন, বিশ্লেষণবিমুখ, স্পর্শভীরু—সমালোচনার ছুরি-কাঁচি ছোঁয়াবামাত্রই তা যেন প্রাণ হারিয়ে স্তূপের মতো নির্জীব লুটিয়ে থাকবে। অথচ মোটেই কিছু কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়—প্রতি মুহূর্তেই তা টান দেয় আমাদের, আহ্বান করে, আমন্ত্রণ জানায়—কোনো আশ্চর্য চিঠির মতো তার আবেদন, সরল কিন্তু অচেনা কোনো ভাষায় যেন তার সব সম্পদ আত্মগোপন ক'রে আছে। বস্তুত এইসব রচনার পরতে-পরতে নিজেকেই তিনি ভ'রে দিয়েছেন ব'লে শুধু কেবল তাঁরই ভাবনার কতগুলি সূত্রের প্রতি অভিনিবেশ সমর্পণ করা ছাড়া আর-কিছুই হয়তো আমাদের করণীয় নেই। শুনে হয়তো অনেকেই বলবেন, তাঁর সব রচনা সম্বন্ধেই তো এ-কথা প্রয়োজ্য। কিন্তু ঠিক এই কথাটিই আমাদের মনে রাখা জরুরি: তাঁর শিশুসাহিত্য তাঁর সমগ্র রচনার ধারা থেকে মোটেই আলাদা নয়। একই রবীন্দ্রনাথের লেখা সবকিছু, আর সেইজন্যই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তাছাড়া আরো-একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাঁর শিশুসাহিত্যের, যেদিকটা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ করা উচিত।

২

সারা জীবনে অনেক ফরমায়েশি কবিতা লিখতে হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথকে। 'সাধনা'র সম্পাদকীয় বিভাগের সম্পূর্ণ ভার যখন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তখন শুধু কবিতাই নয়, গল্প প্রবন্ধ সমালোচনা এমনকি সাময়িকী পর্যন্ত তাঁকে লিখতে হ'তো। কিন্তু তিনি যখন ছোটোদের জন্য লিখতে গেলেন, তখন

বাইরের তাগিদ যতটা না ছিলো, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো নিজের প্রয়োজন। এই কথাটা ভালো ক'রে বোঝা দরকার।

শিশুসাহিত্যের অনেক লেখকের মধ্যেই এই ধারণাটি প্রচলিত আছে যে, ছোটোরা হ'লো অবোধ, অপোগণ্ড ও নিঃসাড়, ফলে তাঁরা 'করুণা ক'রে' ছোটোদের জন্য যা লিখে দেন, তাই যথেষ্ট—তার জন্য জরুরি নয় চিন্তা ও চেষ্টা, নিরীক্ষা ও অনুশীলন, কল্পনা ও সংবেদনা। আর এই জন্যেই তাঁরা যা লেখেন তা হয়ে ওঠে উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ন্যাকা, ভাবালু—কখনো-কখনো তাঁদের রচনাকে এমনকি বিশুদ্ধ ইয়ার্কি ব'লেও বর্ণনা করা যায়—কদর্থে তাঁদের রচনা ছেলেমানুষিতে ভ'রে যায়। এই যেমন একটা দিক, তেমনি আরো-একটা দিক আছে, যেখানে ছোটোদের মানুষ ব'লেই গণ্য করা হয় না—উপদেশ, নীতিবচন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেবল-তথ্য ইত্যাদি দ্বারা তাঁদের রচনা ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে, শিল্পিতার বালাই তাতে প্রায় থাকেই না, থাকে না এমনকি প্রাণের স্পর্শটুকু। এই দু-ধরনের রচনাই যথার্থ শিশুসাহিত্যের প্রতিকূল, যে-কোনো শিশু-পাঠককে সাহিত্য সম্বন্ধে নিঃসাড় ও নিরুৎসুক ক'রে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অথচ ছোটোরা—আশ্চর্য—অনেক সময়েই কিন্তু তেমন ছেলেমানুষ নয়। এক ধরনের ছেলেমানুষি আছে, যেটা ব্যক্তিত্বেরই অন্যতম উপাদান ও প্রতিস্বিকতার বীজ; তা কখনো রপ্ত করা যায় না, চর্চা ক'রে পাওয়া যায় না, তা থাকে সহজাত, রক্তের মধ্যে প্রবহমাণ—আর তার প্রকাশ সব সময়েই সজীব, তারুণ্যময়, উৎসাহে পরিপূর্ণ। বিস্মিত হবার ক্ষমতা, মুগ্ধ হবার ক্ষমতা, সচকিত হবার ক্ষমতা—এ-সবকেই বলতে পারি এই সৃষ্টিশীল ছেলেমানুষির সতেজ লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য।' আর এইজন্যেই সত্যিকার শিশুসাহিত্য নিছকই শিশুতোষ ঝুমঝুমি নয়—যথার্থ সাহিত্যবোধের সঙ্গে তার কোনো প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই; তাকে মোটেই কোনো খণ্ডিত, কি অপূর্ণ কি অলীক প্রদেশ ব'লে গণ্য করার কারণ নেই—তাতে থাকতে পারে পূর্ণ ও পরিণত জীবনের নানা স্পন্দন, বিশ্বসংসারের যাবতীয় বস্তু ও রহস্য, মানবসত্তারই বিস্ময়কর উন্মীলন। সেইজন্যই একদিকে ছোটোদের দাবি যেমন শুরু হয় আবহমান ও চিরজীব সাহিত্যসৃষ্টি থেকে, তেমনি অপরদিকে শিশুসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশে বড়োদের কৌতূহল ও অনুরাগও মোটেই

কিছু কম নেই। ছোটোদের বইপড়ার শুরু সেই মহাকাব্য থেকে, আর ধীরে-ধীরে পরিধি বড়ো হয়, অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে, পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত হয় বিশ্বের পুরাণ ও রূপকথা, ভালো লাগে 'দোন কিহোতি', 'রবিনসন ক্রুশো', 'গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত', ভালো লাগে ডিকেন্স, তলস্তয়, শেক্সপীয়র কি য়ুগো। অপরদিকে হান্স আণ্ডেরসেন কি সেলমা লাগেরলোফ, এডওয়ার্ড লিয়ার কি লুইস ক্যারল, জুল ভের্ন কি স্টিভেনসন — এঁদের সম্বন্ধেও কি বড়োদের কৌতূহল কিছু কম? আসল কথা, জীবনে কখনো-কখনো এমন মুহূর্ত আসে, যখন সকল ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে এক বিপুল অখণ্ডতাবোধের সম্মুখীন হই আমরা। আর এই অখণ্ডতাবোধ উৎসারিত হয় লেখকদেরই ব্যক্তিত্ব থেকে — 'ছোটোদের', 'বড়োদের', সাহিত্যের প্রভেদটা এ-রকম নয় — আসলে লেখক কার জন্য লিখেছিলেন, কোন চাপ থেকে লিখেছিলেন, এটাই হ'লো জিজ্ঞাসা। প্রশ্নের উত্তর যদি হয় এইরকম, 'লিখেছিলেন নিজের জন্য — না-লিখে পারেননি ব'লে,' তাহ'লেই যাবতীয় জটিলতার নিরসন। এমনকি যদি ফরমায়েশি রচনাও হয়, তাকে উত্থিত হ'তে হবে নিজের অভিজ্ঞতার মর্মমূল ভেকে। 'ছোটোদের জন্য' রবীন্দ্রনাথ যা-ই লিখেছিলেন, সব তাঁর নিজের ভিতর থেকে উৎসারিত হয়েছিলো — বাইরের উপলক্ষ বা ফরমায়েশ যা-ই থাক না কেন।

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটোদের জন্য লিখলেন, সব সময়েই তা জীবনের গভীর থেকে প্রেরণা জুগিয়েছিলো। প্রথম লিখতে শুরু করেছিলেন 'বালক' পত্রিকার আমল থেকে : গল্প, কবিতা, উপন্যাস, গীতিনাট্য, গান ও স্বরলিপি প্রবন্ধ, হাস্যকৌতুক — কী নয়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন তিনি ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু করলেন, তখন ব্যাপারটি বাইরে থেকে ছিলো অত্যন্ত নৈমিত্তিক, একটি তাৎক্ষণিক উপলক্ষঘটিত : আমরা জানি 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব ক-টি কবিতাই তিনি রচনা করেছিলেন মাতৃহীন শিশুদের সান্ত্বনা দেবার জন্য — একান্তই ব্যক্তিগত ও আপন ব্যাপার ছিলো তা। কিন্তু মনে হয়, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ছিলো নিতান্তই আপতিক উপলক্ষ — কেননা যখন সেই মাতৃহারা শিশুদের জন্য তিনি এই আশ্চর্য কবিতাগুলি রচনা করলেন, তখন কি তিনি নিজের বাল্যবেলার সেই বিষণ্ণ অভাববোধটিকে স্মরণে আনেননি? জোড়াসাঁকোর সেই মস্ত বাড়িটিতে ছোটোদের থাকতে হ'তো গৃহভৃত্যদের শাসন ও তত্ত্বাবধানে — মায়ের সঙ্গে দেখা হ'তো কচিৎকখনো। ফলে 'মা' নামক

অভিজ্ঞতাটিকে সেই বয়সেই তাঁকে মনে-মনে বানিয়ে নিতে হয়েছিলো ; মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি তিনি সেই শিশু-রবিরই প্রতিভাস ছাখেননি ? 'পুরোনো বট', 'রাজার বাড়ি', 'কাগজের নৌকা' এইসব কবিতা নিশ্চয়ই আমাদের চট ক'রে মনে প'ড়ে যাবে এখানে, যারা এক স্পর্শ-ভীরু ও উন্মীলমান জগতে আমাদের নিয়ে যায়, যেখানে ধীরে-ধীরে আমরা আবিষ্কার ক'রে নিতে পারি ছোট্ট রবীন্দ্রনাথকে যিনি শীতকালের শেষ রাতে গায়ে শাল জড়িয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে শিশিরের শব্দ শুনতেন, যিনি জল পড়া ও পাতা নড়ার অবিরাম দোলার মাঝখানে 'শুনেছিলেন' ছন্দের হিল্লোল। 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ' পড়তে-পড়তে স্পষ্ট দেখতে পাই এই কবিতাগুলির নায়ককে, এক ভাবুক শিশুকে—যে কল্পনায় এক আলোছায়ার জগৎ রচনা ক'রে নিচ্ছে। আলোছায়ার জগৎ, আশ্চর্যের জগৎ: সেখানে, ইচ্ছেমতো মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবার জন্ত কখনো হ'য়ে-ওঠা যায় 'চাঁপার গাছে চাঁপা', কখনো-বা হওয়া যায় জলের মধ্যে ঢেউয়ের হিল্লোল। রোজ যা তা কত কী ঘটে ; তার বিরুদ্ধে, এই অতি সাধারণ নিস্তরঙ্গ তুচ্ছ দৈনন্দিনের বিরুদ্ধে, যে তৈরি ক'রে নেয় স্বয়ম্পূর্ণ এক কাল্পনিক বিশ্ব, যেখান আকাশ হ'লো মা, আর চাঁপাগাছ সেই ভাবুক শিশুটি। রবীন্দ্রনাথ বলতে আজকের দিনে আমরা যাঁকে বুঝে থাকি, তাঁর সব প্রবণতাই এইসব কবিতার ভাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে আছে, আর হঠাৎ-হঠাৎ যখন তা রশ্মিজ্বলা রক্তিম বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে দেয়, তখনই দূর-কালের দিকে জানলা খুলে যায়, হঠাৎ-হঠাৎ হাওয়ায় জেগে ওঠে লুকোনো ব্যঞ্জনা, তারই আঘাতে ফুলে ফেঁপে ওঠে কাগজের নৌকার অলৌকিক পাল, আর নতুন ক'রে যাত্রা শুরু হয় দিগন্তের দিকে। এই কবিতা-গুলির ভিতরে কেবল যে শিশুনায়কটিই কবিত্ব দ্বারা আক্রান্ত ও উজ্জীবস্ত, তা-ই নয় ; যা-কিছু আছে প্রাকৃতিক ও নিশ্চেতন, তাদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আরোপ ক'রে দিয়েছেন, ফলে এমনকি মস্ত ঢ্যাঙা তালগাছ শুদ্ধ এক ভাবুক ও বিষণ্ণ কবি হ'য়ে দেখা দেয়, ফুল হ'য়ে যায় প্রজাপতি, মিটমিট জোনাকির মতো ছোট্ট হালকা পাখায় উড়ে বেড়ায় প্রদীপের আলো আর পুকুরের জল ডানা নেড়ে আকাশে উড়ে যায় মেঘ হ'য়ে। কী ক'রে সম্ভব এই রূপান্তর, কোন আশ্চর্যের স্পর্শে—এই প্রশ্নের উত্তরে এক মুহূর্তও ভাবতে হয় না আমাদের, চোখ বুজেও ব'লে দেয়া যায়—রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথই সেই আশ্চর্যের

সংক্রাম, অপ্রতিহত কল্পনার অধীশ্বর, ভাবুকতায় অদ্বিতীয়; যদি তিনি এ-সব রচনায় নিজের ব্যক্তিত্বকে কেটে ছেঁটে ছোটো ক'রে দিতেন, যদি বালসেব্য কবিতা রচনার জন্য তিনি অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, তাহ'লে – সন্দেহ নেই – এ-সব কবিতা এত বিচিত্ররূপে উপভোগ্য হ'তো না। যেহেতু স্বয়ং তিনি আছেন, তাই আছে অবারিত দিগন্তের ডাক, যা পরে জগতের আনন্দমঞ্চে এক বিপুল ও রোমাঞ্চকর অভ্যর্থনার মতো দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়েছিলো; যেহেতু তিনি নিজে আছেন, তাই আছে 'দুই আমি'র সেই অবিশ্রান্ত রহস্যময় দ্বন্দ্ব যেখানে নীড়ে আর আকাশে, কুলায় আর কালপুরুষে, রূপে আর অরূপে অবিরাম কানাকানি চলেছে[৩]। ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়ে তিনি কৌটোর মধ্যে গন্ধের মতো সম্পূর্ণ ভ'রে দিয়েছেন নিজেকে – কিংবা, তাঁর নিজের উপমা ব্যবহার ক'রেই বলা যায়, যেন জলের মধ্যে ঢেউ হ'য়ে তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন নিরবধি সমুদ্রের দিকে। কোথাও নিজেকে সংকুচিত করেননি এতটুকু, হারাননি তাঁর সচেতনতা, তাঁর অস্মিতা, ব্যক্তিত্বের বিরাট প্রসার – বরং তাকেই নিংড়ে একেবারে যেন সারাৎসারে পরিণত ক'রে দিয়েছেন।

৩

এ-রকম হবার আরেকটা কারণ ছিলো।

রবীন্দ্রনাথ চিরকাল 'দূর থেকে শিশুকে দেখেছেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদবোধে ব্যথিত হয়েছেন, বার-বার তৃষিত হয়েছেন তাকে ফিরে পাবার জন্য': সেই জন্যেই এ-সব রচনা ছিলো তাঁর শৈশবসাধনারই অন্তর্ভূত: 'শিশু হবার ভরসা আবার জাগুক আমার প্রাণে, লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে'। এই একই

৩ বাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথি এলে গৃহকর্তা যদি স্বয়ং আপ্যায়নের ব্যবস্থা না করেন, তাহ'লে অভদ্রতার চূড়ান্ত। রবীন্দ্রনাথ ছোটোদের জন্য লেখা কবিতায় নিজেই শিশুপাঠকদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যান – ছোটোদের কখনো ফিরিয়ে দেন না, বা তাদের কাছে অন্য-কোনো মুখোশ লাগিয়ে হাজির হন না – অনুচর পরিচরও পাঠান না; সেইজন্যেই 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ'-এ এমন-সব বিষয় নিয়ে কবিতা আছে, যা তাঁর তথাকথিত বয়স্কপাঠ্য রচনাতেও পৌনঃপুনিকভাবে উপস্থিত। যেমন, 'শিশু ভোলানাথ'-এর হালকা চপল ছোট্ট কবিতা 'দুই আমি', যেখানে 'দুই রকমের দুই খেলা'র কথা বলছেন – একই সঙ্গে আকাশওড়া আর ভুঁই-খেলার সংক্রামক এক বিবরণ আছে যেখানে। এই বিষয়টি – সবাই জানেন – নানাভাবে নানান সময়ে তাঁর রচনায় ফিরে-ফিরে এসেছে; কখনো জটিল তত্ত্ব রূপে, কখনো সপ্রাণ ও অন্তরঙ্গ চিত্রকল্প রূপে।

বিচ্ছেদবোধ থেকে সহস্র ধারায় নিরর্গল উৎসারিত হয়েছিলো তাঁর প্রকৃতিবন্দনা —গানে গল্পে কবিতায় যার আনন্দবেদনামুগ্ধ অজস্রতা আমাদের বারে-বারে সচকিত ক'রে দেয়। প্রকৃতি থেকেও একইভাবে বিচ্ছিন্ন—এই বোধের ফলেই 'বাদলদিনের প্রথম কদম ফুলের' অন্তহীন পুনরাবৃত্তি পর্যন্ত এক প্রাণবন্ত বিষাদে কম্পমান হ'য়ে ওঠে—আবেগের গভীর চাপে ও বিশ্বাসের তীব্রতায় তা বার-বার আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে 'স্বর্গের জন্য বিরহবেদনা।' বাইরে থেকে সংগ্রহ করা কোনো ব্যাপার নয়, ভিতর থেকে তা হ'য়ে উঠেছে—আয়োজনহীন, আড়ম্বরহীন, অনায়াস ও স্বয়ম্বশ—ঠিক যেমন ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন; আর সেইজন্যেই এই পৃথিবী যেমনভাবে দিনে-দিনে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর কাছে, তারার ভাষায়, জলের রোলে, মেঘের রঙে, গাছের গড়নে, ফুলের গানে যেমনভাবে বারে-বারে ডাক পাঠিয়েছে তাঁর কাছে, মোহিতভাবে ঠিক সেই কথাটিই তিনি অফুরন্ত বলেছেন—সরল, কুণ্ঠাহীন, অবারিত। এইজন্যই তালগাছ হৃদয়দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে যায়, 'প্রথম কদম ফুল' রূপান্তরিত হ'য়ে যায় স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডে। বিচ্ছেদ ব'লেই আহ্বান—এটাই তাঁর গান ও কবিতার অন্তর্লীন ন্যায়শাস্ত্র। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারছেন না ব'লেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার এই প্রবল আকুলতা। শৈশব থেকে বিচ্ছিন্ন—তাই তৃষিতভাবে আবার শিশু হ'য়ে-ওঠার সাধনা। সীমা আছে ব'লেই অসীম, রূপের জন্যই অরূপ। এই আর্তিময় সম্বন্ধের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের রচনাবলিতে সজীবভাবে প্রকাশিত—সমালোচকদের এই ধারণাটির ভিতর কিছুটা সত্যি আছে বৈকি। শিশু কি কখনো শৈশবসাধনায় বদ্ধপরিকর? বনের গাছ কি কখনো গাছ হ'য়ে-ওঠার জন্য সচেষ্ট? এই সরল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য রচনাগুলি, আর এ-রকম সরল ব'লেই সমালোচকদের মনস্তাপের কারণ। সমালোচনার প্রচলিত ছুরি-কাঁচি এখানে কাজ করে না, কারণ এ-সব রচনার ভাঁজে-ভাঁজে তিনিই অন্তঃপ্রবিষ্ট যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ব্যক্তিত্বের ধর্মই জলের মতো—কূলপ্লাবী ও প্রবহমাণ—সেই কারণেই সদর স্ট্রিটের বাড়িতে স্বপ্নভঙ্গের পর থেকে তাঁর সমস্ত রচনায় মেঘের ঘটার মতো বিষাদ ক'রে এলো, সমস্ত রচনাই দিগন্তরের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। ছোটোদের প্রতি উদ্দিষ্ট রচনারও তাই এ-রকম ব্যাকুল ও দূরগামী না-হ'য়ে উপায় ছিলো না।

এটা তিনি স্পষ্ট ব'লে গিয়েছিলেন 'যাত্রী' নামক গ্রন্থের 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' অংশে। সেখানে এটা বিশদভাবে বলা আছে যে এই কবিতাগুলো তিনি লিখেছিলেন নিজের জন্য – এগুলো তাঁরই আত্মপ্রকাশের বাহন :

> দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্য এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশু-লীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশু-লীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।[৪]

অবগাহন – এরা সত্যি তাই। স্নেহ ও বাৎসল্যের এই তরঙ্গে অবগাহন ক'রে আমরাও স্নিগ্ধ, নন্দিত ও সুকুমার হ'য়ে উঠি। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ'-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, ঠিক এমন কবিতা কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ ; 'অপাপবিদ্ধের গান' ও 'অভিজ্ঞতার গান' এই দুই জোড়া-বইয়ের নাম মুহূর্তে আমাদের মনে প'ড়ে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্লেকের কবিতাগুলিকে এদের তুলনায় অনেক বেশি 'হিংস্র ও আমিষখোর' ব'লে মনে হয়, এবং হয়তো একদিক থেকে অনেক বেশি সরলীকৃতও – তাতে বড়ো তীব্র ও স্পষ্ট ভাগ, এই অর্থে সরলীকৃত। অপাপবিদ্ধের সরলতার পর থাকে অভিজ্ঞতার বিপুল ও অনর্গল রক্তক্ষয় ; ব্লেক সেদিক থেকে নিষ্ঠুর, সন্দেহ নেই, কিন্তু সদর্থেই এই নিষ্ঠুরতা : তিনিও চেয়েছিলেন – রবীন্দ্রনাথের মতোই – সর্বজীবে ও সর্বভূতে তাঁকেই প্রত্যক্ষ করতে, কিন্তু এখানেই হয়তো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের মূল বিরোধ, যার ফলে শুভ্রসুকুমার মেষশাবক সত্ত্বেও জলন্তউজ্জ্বল বনের বাঘ ওৎ পেতে থাকে। সত্যি যে, খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্লেকের দিব্যদৃষ্টির তৎকালে বিরোধ বেধেছিলো, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগতে পাপবোধ প্রবল ব'লেই হয়তো ব্লেকের কবিতায় এত বেশি হারিয়ে-যাওয়া ছেলেমেয়ের ভিড়, শীতে-কুয়াশায় যে-অনাথেরা অবিরাম ক্লিষ্ট ও পিষ্ট হ'তে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরাদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো সেই জগৎপারাবারের তীর, যেখানে ছেলের দলের মহামেলা,

৪ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি : রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃ ৫৬৬

যেখানে ভীষণ ঢেউও শেষকালে পূজার মন্ত্র বলে। সেখানে আকাশের ঝড় সুদূর জলে তরী ডুবিয়ে দেয় আর মরণদূতেরা উড়ে চলে বটে, কিন্তু তবু ছেলেদের খেলা মেলা ভাঙে না, সারা বেলা ফেনিল ওই সুনীল জল সেখানে নাচের হিল্লোলে ব'য়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট মেয়ে যখন বলে 'হারিয়ে গেছি আমি', তখনও ব্লেকের সঙ্গে তফাৎটা স্পষ্ট থাকে—স্নেহে বাৎসল্যে করুণায় ভরা তাঁর কবিতা, আড়ালে গোপনে কাজ ক'রে যায় ঝলমলে এক কৌতুকবোধ। একই সঙ্গে হাসি-কান্না বিষাদ-কৌতুকের ছায়াছবি তাঁর কবিতাগুলি; বিচিত্র ও বিপুল; আর এত হালকা, নির্ভার ও বিশ্লেষণবিমুখ যে তা যেন 'প্রায় অপার্থিব' হ'য়ে উঠেছে। তুলনায় তাঁর শেষ বয়সের শিশুসাহিত্যের মধ্যে বরং একজন রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, মানুষের হিংস্রতা ও নির্মমতায় যিনি চঞ্চল ও উত্তেজিত। 'ছড়া', বা 'গল্পসল্প'তে রাগ বা অভিসম্পাত কম নেই। অথচ এককালে, 'রাজর্ষি' লেখার আগে, স্বপ্নে শুনেছিলেন প্রশ্ন: 'এত রক্ত কেন?', কিন্তু লেখা তাঁর হিংস্র হয়নি—অন্তিম আস্থার চাপে ওই প্রশ্নের উত্তরকেও তিনি অন্য দিগন্তের সন্ধানী করিয়েছিলেন—মনুষ্যত্বের উপর তাঁর আস্থা তাতে রঘুপতি সত্ত্বেও বরং প্রখররূপেই বিদ্যমান ছিলো।

৪

কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, গান, স্বরলিপি, প্রবন্ধ—ছোটোদের জন্য সবকিছুই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিছু লেখা সরকারিভাবে শিশুসাহিত্য ব'লে গণ্য; অনেক লেখা যদিও-বা তা নয়, তবু ছোটোদের পড়তে বাধা নেই। কেবল 'বাধা নেই', তাও বলা যায় না—ছোটোদের কাছেও তাদের আবেদন মোটেই কম নয়। হ'তে পারে, ছোটোরা তার পুরো অর্থ ধরতে পারবে না, অনেক কিছুই তাদের কাছে ঠেকবে অস্পষ্ট, কিন্তু তবু ছোটোদের উপর তাদের অভিঘাত হবে অসামান্য। তাছাড়া, এমন অনেক বিষয় বা প্রসঙ্গ আছে, যা, অনেকরই ধারণা ছোটোদের কাছে উচ্চার্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্তত কখনো তা ভাবেননি। অনেক রচনারই প্রসঙ্গ শিল্প ও সাহিত্য, প্রেম ও মোহভঙ্গ, বিরহ ও জাগরণ। সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, ধনতান্ত্রিক নীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—এ-সবও তিনি ছোটোদের জন্য আলোচনা করেছেন। যাকে বলি ব্যক্তিগত

প্রবন্ধ, এককালে যাকে বলা হ'তো রম্যরচনা, ছোটোদের জন্য তাও তিনি রচনা করেছিলেন। রূপক ব্যবহার করেছেন তিনি রচনায়, ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীকও, মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তের বিশ্লেষণও বর্জিত হয়নি, নরনারীর নানা জটিল সম্বন্ধও উন্মোচিত হয়েছে। কাজেই, বাহুল্য হবে, যদি বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই অর্থে শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞার্থ কোনোভাবেই আলাদা বা অন্যরকম কিছু ছিলো না। ছোটোদের জন্য লিখতে গেলে সবকিছু তরল ক'রে আনারও দরকার নেই, আবার দরকার নেই অহেতুক জাঁকজমক দেখানোর—এটাই তাঁর বিশ্বাস ছিলো। তিনি চেয়েছিলেন সব হ'য়ে উঠুক শিল্পকর্ম, জৈব অর্থে প্রাণবন্ত—রচনার মধ্যে যা থাকে প্রকরণের দিক, শৈলীর দিক, তাকে তিনি কখনোই অবহেলা করেননি। কৌতুকের বোধ তাঁর রচনায় অবিরল—কিন্তু কখনও তা ছিবলে বা ফাজিল হ'য়ে পড়েনি। অভিনব, ইঙ্গিতময়, সংক্রমণধর্মী, গভীর, শিল্পিতায় পরাক্রান্ত, সজীব—এই রকম বিশেষণের পর বিশেষণ বসিয়ে যাওয়া যায় এই রচনাগুলি সম্বন্ধে। কেননা নিছক 'লোকরঞ্জন' বা 'ক্ষমতার কায়দা দেখানো'ই তাঁর অভিপ্রায় ছিলো না—ছিলো 'নিতান্ত নিজের গরজ', ছিলো ভিতরকার তাগিদ, ছিলো নিজেকে প্রকাশ করার অসংবরণীয় উন্মাদনা। আর তাই রচনাগুলি এমন নিবিড়ভাবে জীবনের শিহরন ও অভিজ্ঞতায় স্পর্শময় ও স্পর্শসহ হ'য়ে উঠেছে। শিশুদের বিশ্ববিদ্যালয়, এক অর্থে; জীবনে ও সাহিত্যে দীক্ষা দেয়া হচ্ছে এখানে, জাগিয়ে দেয়া হচ্ছে মন ও বোধবুদ্ধি, আর সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় ব'লেই গুরুগিরি নেই, পিঠচাপড়ানি নেই, আছে বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিরল সম্মাননা।

শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে 'গল্প বলো' ; সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে, তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ত নেই। সে কোনো একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে ; সে বাস্তব।—সাহিত্যতত্ত্ব / সাহিত্যের পথে

১

ইংরেজিতে যাকে *Fairy tales* ব'লে থাকে, রূপকথা তারই বাংলা নাম। শব্দের উৎস খুঁজে দেখলে কথাটার প্রথম অর্থ দাঁড়ায়, '*things enchanted*' – হয়তো এইজন্যেই কেউ-কেউ রূপকথাকে *wonder tales* ও ব'লে থাকেন। কালক্রমে মূল অর্থ থেকে স'রে এলো কথাটা, মায়াভরা বস্তর বদলে *fairy* হ'য়ে গেলো ডানাওলা রূপসী মেয়ে, অলোকসম্ভব নানা ক্ষমতার অধিকারিণী, এমনকি প্রকৃতি ঠাকরুনকে শুদ্ধ যার হুকুম মেনে চলতে হয়, কিন্তু তবু হয়তো মূল, ব্যুৎপত্তিগত, অর্থটি এখনও চাবিকাঠির কাজ করতে পারে। আলোকপ্রাপ্তির পরে ইওরোপে যখন ঐতিহ্য, নানা প্রচল ও পার্থিব বিবিধ বিষয়ে চোখ পড়েছিলো, তখন স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাবশতই কারু-কারু ঝোঁক পড়েছিলো জাতির আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ ও লোককথার দিকে; উদ্দেশ্য ছিলো এই সবকে বিশ্লেষণ ক'রে ছদ্মবেশী ও লুকোনো অর্থগুলিকে বার ক'রে জাতির মানসকে বুঝে নিতে হবে। রোমক সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকে লোককথা সংকলনের একটি ধারা ছিলো – পেন্তামেরোন, গেস্তা-রোমান্থম্ ইত্যাদি তারই সাক্ষী; ফ্রান্সে মারী দ্য ফ্রাঁস লা ফঁতেন বা শার্ল পেরোর ভূমিকাও এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য, আলেমানদেশে গ্রিমভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচেষ্টা তো নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও অন্যান্য সম্পর্কিত-জ্ঞানকাণ্ডের বিপুলায়তন ও সচেতন একটি ধাপ ব'লে স্বীকৃত হ'লো। পরে ইওরোপের নানা দেশেই এ-দিকে ঝোঁক পড়লো; ক্রমে এই চর্চার ফল স্বরূপ গ'ড়ে উঠলো সমাজবিজ্ঞানের মস্ত একটি ধারা, আর মনোবিজ্ঞানের বিকাশের পথও অবারিত হ'লো, সুগম্য হ'লো।

বাংলাদেশে যখন আলোকপ্রাপ্ত উনিশ শতকে নবজাগণের উন্মেষ হ'লো, তখন সাহিত্যিকদের ভিতর অনেকেরই মনীষা এইদিকে নিবিষ্ট হয়েছিলো।

আগেই দেখেছি এইদিকে সচেতন অনুপ্রাণনা ছিলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের : লৌকিক কাহিনী সংগ্রহ করার জন্য অনেক লেখককেই তিনি প্ররোচিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। উদ্ভাবিত বা স্বকপোলকল্পিত কাহিনী বা ছড়া নয়—লোকের কাছ থেকে শুনে-শুনে অবিকল লিপিবদ্ধ করতে হবে, অটুট রাখতে হবে লোকায়ত বাণীভঙ্গি ও মনোভাব, অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে লৌকিক স্বাক্ষর। 'নিজে সৃষ্টি ক'রে কী হবে, দেশের নানা কোণে যে-সব মূল্যবান ও ঝলমলে রত্নরাজি ছাইচাপা হ'য়ে লুকিয়ে আছে, তা-ই সংগ্রহ করাই যথেষ্ট'—হয়তো ভিতরে-ভিতরে এই অনুভবটিও তাঁদের মধ্যে কাজ করেছিলো।

কিন্তু অন্য-এক ধরনের রূপকথাও আছে, যেখানে জগতের সব রহস্যময় ও বিশ্লেষণবিমুখ ঘটনাও চকিতে নতুন-নতুন অর্থে ভ'রে যায়। কল্পনায় ভরা সেই জগৎ, হয়তো মন্ত্র-পড়া ও অলৌকিক—কিন্তু তারই আড়ালে নিখিল চিত্তের উদ্দেশে বাণী পাঠিয়ে দেন লেখকেরা। নিছকই প্রচলিত রূপকথার সুলিখিত রূপ এগুলি নয়—সম্পূর্ণই নতুন উদ্ভাবনা, সব অর্থেই যাকে বলা যায় রচনা, যার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন স্বয়ং লেখক—কোনো গোষ্ঠী বা জাতি নয়। হ'তে পারে এমন এষণা তিনি ব্যবহার করেছিলেন যা ছিলো সম্পূর্ণই গোষ্ঠীগত ; হ'তে পারে মনের এমন-সব বৃত্তি তার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, যা উদ্ভূত হয়েছে সমষ্টির অবচৈতন্য থেকে ; হ'তে পারে এইসব রচনার মধ্য দিয়ে এমনকি প্রচলিত লৌকিক বাসনা-কল্পনার সমান্তর ফুটে উঠেছে—কিন্তু তা তো যে-কোনো শিল্পসৃষ্টির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে, যদি তা শিল্পী-লেখকের অভিপ্রেত হয়।

আর এই ধরনের রূপকথা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন দিনেমার দেশে হান্স খ্রিস্টিয়ান আণ্ডেরসেন: রূপকথার সঙ্গে দৈনন্দিন, কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, তামাশার সঙ্গে কান্না, বিদ্রূপের সঙ্গে স্নেহ মিশিয়ে এমন 'রঙবেরঙের অদ্ভুত খামখেয়ালি গল্প' তাঁর আগে আর-কেউ লেখেননি। তাঁর আত্মার সম্ভার এই রূপকথাগুলি, সমস্ত কুণ্ঠিত গুণ্ঠন মোচন ক'রে সেখানে তিনি সরাসরি নিত্যকালের সঙ্গে কথা বলেছেন। তার ভিতর তিনি স্পর্শ করেছেন তাঁর যুগের তাঁর সময়কার সমস্যা ও চিরকালের সমস্যা, আর তাপে ও স্পন্দনে উজ্জীবিত তাঁর গল্পের মধ্যে তাঁকেই আমরা সবচেয়ে বেশি ক'রে অনুভব করি। অর্থাৎ, তাঁর রূপকথাগুলি কিছুতেই লোকসাহিত্যের অন্তর্ভূত নয়, নয় অনুরচনা কি

ছায়ানুসরণ, বরং সম্পূর্ণরূপেই তা মৌলিক, তাঁর আত্মপ্রকাশের নির্ভীক উপায়। মানুষের মন ও হৃদয়কে খুব ভালো ক'রেই জানতেন তিনি; কিন্তু শুধু কি মানুষ? পশু, পাখি, গাছ, ফুল আর জলকন্যা, ফুলের পরি, সাংঘাতিক ডাইনি কি মানুষের ছায়া—সবই তাঁর গল্পের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মতো স্পন্দমান; প্রাণ ভ'রে দিয়েছেন তিনি তাদের ভিতর—এমনকি একটা ভাঙা পুতুল, রবারের বল, রংচটা লাটিম কি সামান্য একটা ছুঁচ পর্যন্ত প্রাণ পেয়ে কপালে টোকা মেরে ব'লে গেছে, 'এই-যে আমি!' কোনো ধর্মশাস্ত্রে আছে, ধুলোবালি দিয়ে মানুষের মূর্তি গ'ড়ে যেই বলা হ'লো প্রাণ হোক, অমনি ধমনীর ভিতর প্রবাহিত হ'লো তপ্ত রুধির, আর হৃৎপিণ্ড বেজে উঠলো ধ্বক-ধ্বক। মনে হয় সেই অলৌকিক শক্তি যেন তাঁরও ছিলো, এতই অনায়াসে তিনি তুচ্ছতমের ভিতরেও প্রাণ সঞ্চার ক'রে দিয়েছিলেন।

রূপকথাও যে আত্মপ্রকাশের যোগ্য বাহন হ'তে পারে, হান্স আণ্ডেরসেনের দেড়শোর উপর রূপকথার এই শিক্ষাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন মৌলিক রূপকথা রচনার প্রেরণাস্বরূপ কাজ করেছিলো। চট ক'রে আমাদের অস্কার ওয়াইল্ডের কথা মনে প'ড়ে যায়, যাঁর রূপকথার সঙ্গে আণ্ডেরসেনের ছিলো অদ্ভুত মিল। ওয়াইল্ডের অন্যসব লেখা ও চালিয়াতি লোকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু কে ভুলতে পারবে তাঁর স্বার্থপর দৈত্য, সুখী রাজপুত্র, তারাঝরা ছেলে আর মাস্তান হাউইকে? সেলমা লাগেরলোফের রূপকথার ভিতর ভাঁজে-ভাঁজে মিশে আছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া—তার ইতিহাস, পুরাণ, ভূগোল, ঋতুরঙ্গ, অরোরা বোরিয়ালিস, দিনরাত্রি, অনুভাবনা, সমস্ত সমেত। কারলো কল্লোদির কাঠের পুতুল পিনোচ্চিয়ো কি দুষ্টু বাঁদরটি, জেমস ব্যারির পিটার প্যান আর কেনসিংটন গার্ডেনস, এ. এ. মিলনের ক্রিস্টফার রবিন ও তার সঙ্গীরা, চার্লস কিংসলের চিমনি-ঝাড়ুদার নোংরা-টোংরা দুষ্টু টম—কে ভুলতে পারবে এদের? ডিকেন্সের মাছের কাঁটার ভোজবাজি, জর্জ ম্যাকডনাল্ড-এর ফুটফুটে ছোট্ট রাজকন্যা, কেনেথ গ্র্যাহাম-এর উইলোবনের হাওয়ার শব্দ—এইসব দিয়ে যে-কোনো ছোট্ট ছেলের পড়াশুনো শুরু—কিন্তু তারা কি কেবল শৈশবেরই সঙ্গী? আঁতোয়ান দ্য সাঁতেকজুপেরি তার ছোট্ট রাজকুমারের মধ্য দিয়ে অন্য ভুবনের আহ্বান পাঠিয়েছিলেন—স্মৃতি, বিষাদ, ভালোবাসায় ভরা মরুভূমির সেই হাসিকান্নার গল্প কি কেবল ছোটোদেরই গোপন সম্পদ? হুয়ান রামোন

হিমেনেথ-এর প্লাতেরো কি নিছকই একটি ছোট্ট গাধার ছানা—সরল, স্পর্শাতুর, খাড়া-খাড়া কান, চোখের মধ্যে বোকা-বোকা স্নেহ? মনে প'ড়ে যায় লেভ তলস্তয়ের কাহিনী-ত্রয়োবিংশ, অতি সহজে ও সরলভাবে যে-সব গল্পে তিনি তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ভ'রে দিয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যেও অনেকেই এই রূপকথাকে আত্মপ্রকাশের উপায় হিশেবে বেছে নিয়েছিলেন: অবনীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, লীলা মজুমদার—এঁদের লেখা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু সব আগে, বাংলা সাহিত্যের অন্যসব বিভাগের মতো, সাহিত্যের এই নিঃসংকোচ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম না-করলে অন্যায় হবে। তিনি যে 'বাংলা সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ', এখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর সেই বহু-উদ্‌ধৃত উক্তিটি উৎকলন করা যেতে পারে। 'লিপিকা' 'গল্পসল্প', 'সে'—বিশেষভাবে এই তিনটি বইতে এমন অনেকগুলি ছোটোগল্প[১] রয়েছে, সাহিত্যের এই সরল বিভাগে যাদের ন্যস্ত না-ক'রে আমাদের উপায় থাকে না। অনিবার্যভাবেই তাঁর স্বাক্ষর পড়েছে প্রতিটি রচনায়, বাণীভঙ্গির উজ্জ্বল বিলাস উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে রচনাগুলি, একেকটি উপমা হঠাৎ কোনো গোপন সীমান্তরের দিকে আলো ছিটিয়ে দেয়, দীপ্ত বিদ্যুতের মতো ঝকমক ক'রে ওঠে স্নেহভরা কৌতুক আর ঠাট্টা, আর সর্বোপরি, অধিকাংশ রচনা থেকেই বিকীর্ণ হয় মেদুর বিষাদ, মহাকবির করুণা যেখানে অন্তঃশীলা স্রোতের মতো দূরের উদ্দেশে ধাবমান। কেলাসিত স্ফটিকের মতো একেকটি রচনা, স্বচ্ছকান্তি, সম্মোহিত, 'দেহময় অথচ দেহচ্যুত'—এত হালকা নির্ভার আর স্পর্শভীরু; যেন মানতে হ'লে পুরো রচনাটিকেই মেনে নিতে হবে, যেমন আছে তেমনি; যেন কোনো জৈব সত্তা, সমালোচনার কোনো ছুরি-কাঁচিই যাকে

১ 'লিপিকা'কে কবিতা বলা উচিত না কি ছোটোগল্পের সংকলন হিশেবে গণ্য করা কর্তব্য, এই বিতর্ক এড়িয়ে গিয়ে কতগুলি রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করি, যাদের রূপকথা ব'লে মেনে নেয়াই বোধকরি ভালো: ভুলস্বর্গ, রাজপুত্ত্র, সুয়োরানীর সাধ, বিদূষক, তোতা-কাহিনী, পট, নতুন পুতুল, উপসংহার, পুনরাবৃত্তি, সিদ্ধি, রথযাত্রা, পরীর পরিচয়, মুক্তি। 'গল্পসল্প'র বড়ো খবর রাজরানী, চন্দনীও এই একই গোত্রের। 'সে'-র মধ্যেও টুকরো-টুকরো উপাখ্যান আছে কতগুলি। তাছাড়া আছে 'একটি আষাঢ়ে গল্প,' 'ইচ্ছাপূরণ'; নাট্যাকারে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'তাসের দেশ,'; কবিতার ভিতর 'বিম্ববতী', 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা' নামের যুগ্মকবিতাটি, 'হিং টিং ছট', 'জুতা-আবিষ্কার' প্রভৃতি। অস্কার ওয়াইল্ড মাত্র ন-টি রূপকথা রচনা করেছিলেন, কিন্তু তবু যে-কোনো রূপকথার আলোচনাতেই তাঁকে স্মরণ না-করলে চলে না। বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের দাবিও ঠিক এই রকমই; অর্থাৎ, সংখ্যাগত নয়, উৎকর্ষগত।

কেটেছেঁটে কিছুতেই মানানসই মাপের ভিতর এনে ফেলতে পারে না। অথচ আশ্চর্য, কোনো-কোনো রচনা তো রীতিমতো নীতিকথা শুনিয়ে যায় আমাদের, উপদেশ দেয়, পরামর্শ দেয়, সব অর্থেই একেবারে ধার্মিক হ'য়ে ওঠে।

আর এই জন্যই হান্স আণ্ডেরসেনের রূপকথাগুলির স্বভাবের সঙ্গে এদের মিল। রূপকথাগুলির মধ্যে আণ্ডেরসেন নিজেকে খুলে দেখিয়েছেন, নিজের কথা বলেছেন, তুলে দিয়েছেন ধুলোমাটি গাছপালার উপকার আবরণ, যার ফলে সবাই জ্যান্ত হ'য়ে উঠে কথা বলে আমাদের সঙ্গে, কথা বলে খোঁড়া টিনের সেপাই, বড়ো রাস্তার বুড়ো বাতি, হলদে রঙের গরিব মোমবাতি, সমুদ্রের ধারের বুড়ো ওকগাছ, বনের মধ্যেকার স্বপ্নাচ্ছন্ন দেবদারু, বাচ্চা ছেলের হাতের খেলনা, পাখি ফুল হাঁস হাওয়া—সবকিছু। দুঃখকষ্ট, আঘাত, মোহভঙ্গ, ভালোবাসা, বিষাদ, বেদনা, মৃত্যু, পাপ, পুণ্য, শাস্তি, অনুতাপ আর ঈশ্বর—এইসব মৌলিক বিষয় নিয়ে তিনি নিজের সঙ্গে কথা বলেছেন এখানে—আর আমরা আস্তে-আস্তে এই আলাপের মধ্যে দিয়েই চিনে নিই সেই নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ ও মহীয়ান কবিকে—মা যাঁর ধোবানি, বাপ যার ছিলেন মুচি—চিনে নিই বিশ্রী হাঁসের ছানাটিকে, যাঁর নাম হান্স আণ্ডেরসেন[২]। নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ, মহীয়ান —এবং নিষ্ঠুরও। 'লাল জুতো', 'ছায়া', কিংবা রুটি যে-মেয়েটি মাড়িয়েছিলো তার গল্প দ্বন্দ্বে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন ও রক্তাপ্লুত। 'ছায়া'র ভিতরে সরাসরি পাপ আর পুণ্যের সংঘাত দেখানো হয়েছে, একই লোকের দুটি দিক; বিভক্ত ব্যক্তিত্বের এই গল্পে জীবনের কালো দিকই শেষ পর্যন্ত জিতে যায়—প্রচলিত রূপকথা হ'লে নিশ্চয়ই পরিণামে কোনো-না-কোনোভাবে পুণ্যের জয় ঘোষণা করা হ'তো। আর কারেন বা ইন্‌গের শাস্তি যে অমন ভীষণনিষ্ঠুর, দেমাক ও অহমিকার যে কোনো ক্ষমাই নেই, এমনকি অনুতাপের

২ ম্যাকসিম গর্কির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে লেভ তলস্তয় কিন্তু হান্স আণ্ডেরসেনের রূপকথার মূল চাবিকাঠিটির সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আণ্ডেরসেনের রূপকথা প'ড়ে এমন-একজন লোকের দেখা পাই যিনি জীবনের সব ব্যর্থতা ও অবহেলা সহ্য ক'রে অবশেষে ছোটোদের কাছে এসে নিজের নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা যে কী বিপুল ছিলো, এটা তারই প্রমাণ—কেননা ছোটোরা, ভদ্রতার বালাই রাখে না ব'লে, কখনও কাউকে ক্ষমা করে না—কাউকে যদি অপছন্দ করে তো চিরকালের মতো অপছন্দ করে, পছন্দ করলেও করে চিরকালেরই মতো। তবু যে আণ্ডেরসেন জেনেশুনে এমন অসহায়- ও নির্ভীক- ভাবে ছোটোদের কাছে গিয়েছিলেন তার কারণই হ'লো তাঁর অপরিসীম নিঃসঙ্গতা ও বিপুল ব্যর্থতাবোধ।

গর্বেরও যে ক্ষমা নেই, এই কথাটা এই দুটি ছোট্ট মেয়ের গল্পে তীব্রভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। হয়তো তার কারণ, কেউ-কেউ বলেন, খ্রীস্টীয় ঐতিহ্য, যেখানে ভালো-মন্দ সদসৎ সিতাসিতের সংঘর্ষ প্রবলভাবে উপস্থিত, যেখানে সব সময়েই শেষ বিচারের ভয়ংকর পূর্বাভাস বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়েসের কোনো-কোনো লেখায় নির্মমতার চর্চা আছে, আছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও টিটকিরি, আছে এমনকি অমঙ্গলবোধও, হয়তো জগৎশুদ্ধ সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নীরক্ত মানুষের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ক'রে আঁকা হয়েছে তথাকথিত উদাসীন চকিত-মনা ও পাগল মানুষদের, কিন্তু তবু আণ্ডেরসেনের ভীষণ ও হানাদেয়া গল্প-গুলির মানসিকতা রবীন্দ্ররচনায় কোনোখানেই নেই। 'বিশ্রী হাঁসের ছানা', 'জলকন্যাদের ছোটোবোন', 'বুড়ো ওকের শেষ স্বপ্ন' কি 'বড়ো রাস্তার বুড়ো-বাতি', এইসব গল্পের নিঃসঙ্গ বিধুর ও বিষাদময় আণ্ডেরসেনই রূপকথার রবীন্দ্র-নাথের সহগামী। 'পরীর পরিচয়', 'সুয়োরানীর সাধ' ইত্যাদি গল্পের আকাশস্পর্শী বিষণ্নতার আড়ালে স্নেহ আছে, আছে অনুকম্পা ও করুণা, আছে সর্বভূতে ও সর্বজীবে দয়া। তথাকথিত 'সফিস্টিকেশন', 'পরিপক্বতা', ছদ্মশালীনতা, ভণ্ড ভদ্রতা ও সহবৎ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আণ্ডেরসেনের মতো রবীন্দ্রনাথও বিরূপ। কিন্তু হান্স আণ্ডেরসেনের গল্পে রাজপুত্র যখন শুঅরচরানের ছদ্মবেশে রাজ-কন্যার মুখোমুখি হয়, তখন তার ইচ্ছেই থাকে ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে এই হৃদয়হীনাকে যোগ্য শিক্ষা দেবার—পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের রাজপুত্র বেছে নেয় কাঠকুড়ুনিকে, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যাদের শিক্ষা দেবার কথা তার মনেই হয় না, আর রাজকন্যারাও কাঠকুড়ুনিতেই রাজপুত্রের রুচি দেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে ব'লে ওঠে, 'ছিঃ।' আণ্ডেরসেন হ'লে এই রাজকন্যাদের কিছুতেই ছেড়ে কথা কইতেন না, তাদের কপালে যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ জুটিয়ে দিতেন। কিন্তু এই তফাৎ সত্ত্বেও রচনার পিছনে দুটি মনই একইভাবে কাজ করেছে—রূপকথা ব'লে, ছোটোদের প্রতি উদ্দিষ্ট ব'লে, নিজেকে খর্ব করার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেননি—এ-সব রচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদেরই ফুটিয়ে তুলেছেন ; কখনও তাঁদের অবলম্বন হয়েছে রূপক, কখনও নির্ভর ছিলো প্রতীক—কিন্তু তাঁরা সব সময়েই ব্যক্ত করেছেন পূর্ণ পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতা।

২

রূপকথার কথা ভাবলেই অনিবার্যভাবে শিশুদের কথা আমাদের মনে প'ড়ে যায়। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, সব রূপকথারই প্রথম গুণ হ'লো সেই নিঃসংকোচ সরলতা, যা অনাবৃতভাবে আদ্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। যাকে 'সফিস্টি-কেশন' বলে, অর্থাৎ যা সামাজিক অভিজ্ঞতার অবদান, শিশুর ভিতরে তা এই কারণেই নেই যে সে তখনও বিস্মিত হ'তে ও বিশ্বাস করতে ভুলে যায়নি। কেবলমাত্র শিশুর কাছেই ধুলোবালি গাছপালা কীটপতঙ্গ সবকিছু জীবন্ত ও স্পন্দিত ; পুতুল-খেলার মূল কথাই হ'লো এই বিশ্বাস করবার ক্ষমতাটুকু : সে যখন পুতুলের বিয়ে দেয়, তাকে গান গেয়ে-গেয়ে ঘুম পাড়ায় বা নানা প্রবোধ ও অবোধ -বাক্যে তাকে সান্ত্বনা দেয়, তখন নিশ্চয়ই সে তাকে মৃত, নির্জীব, নিশ্চেতন, একটি খেলনা ব'লে ভাবে না। তার বিশ্বাসই তাকে দেয় প্রাণ, যার বলে লতাপাতা কাঠকুটো নুড়িপাথর কড়িঝিনুক প্রভৃতি তার যাবতীয় সামগ্রী তুচ্ছতার সীমা অতিক্রম ক'রে মূল্যবান সম্ভারে পরিণত হ'য়ে যায়। কিন্তু ধীরে-ধীরে নষ্ট হ'য়ে যায় এই শৈশবস্বর্গ, হারিয়ে যায় এই আশ্চর্য ভুবন—যেখানে 'আরো'-কোনো 'সত্য'ই ছিলো একমাত্র নিয়ামক। যত বয়েস বাড়ে ও অভিজ্ঞতা জটিল হয়, তত সে শেখে উদ্দেশ্যগোপনের মূল সূত্র, চেপে ঢেকে বানানো ভাষায় কথা বলে, হয় নিস্তাপ ও নিস্তরঙ্গ, বিশ্বাসহীন ও বিনষ্ট। কিন্তু রূপকথা—লুপ্ত শৈশবের এই অমর জগৎ—বারে-বারে আমাদের উদ্দেশে এই বাণী পাঠিয়ে দেয় : 'চুপ করো অবিশ্বাসী'। সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞান যাদের বাতিল ক'রে দেয়, যাদের ভাবে সরল হাবাগোবা বোকামানুষ, রূপকথার ভিতর শেষকালে তাদেরই অনিবার্য জয়। অতিরিক্ত সপ্রতিভতার জন্যই তথা-কথিত চালাকচতুর ছিমছাম ছোকরারা শেষ অবধি বাকতাল্লা ও চালিয়াতি ছাড়া আর-কিছুই করতে পারে না। পৃথিবীর প্রায় দেশেই সেই তিন ভাইয়ের রূপকথার রকমফের প্রচলিত, যেখানে ছোটো ভাইটি পিঁপড়ে, মৌমাছি ও হাঁসকে সম্মান করেছিলো ব'লে, সর্বজীব ও সর্বভূতে দয়া দেখিয়েছিলো ব'লে, শেষ পর্যন্ত প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত হ'লো না ; বরং সে ততটা ওপরচালাক ছিলো না ব'লেই সব অসাধ্যসাধন ক'রে অন্য যারা পাষাণ হ'য়ে গিয়েছিলো তাদেরও পুনর্জীবিত ক'রে তুললো। আর অত্যন্ত সরলভাবেই এই কথা ব'লে দেয় রূপকথা—কোনো ছল নেই, ছদ্মবেশ নেই ; রূপক যদি হয় তবে হয়

অত্যন্ত সরল রূপক, প্রতীক যদি হয় তারও অবলম্বন শৈশবসারল্য; সোজা-সুজি মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে রূপকথা, আর এই নগ্ন, কৃশ ও একান্ত বাণী পাঠিয়ে দেয়: 'ভালোবাসো, স্নেহ করো, অবিশ্বাসী হোয়ো না'। যুক্তির অবতারণা নেই, নেই তর্কশাস্ত্রের বিপুল ও চুলচেরা বিশ্লেষণ, সমস্ত ঘটনাবলিই যেন উপমা বা রূপক হ'য়ে এই বাণী প্রতিধ্বনিত ক'রে দেয়। 'লিপিকা'র 'রথযাত্রা' শীর্ষক রচনাটি মনে করা যেতে পারে: রথের দিন যখন কাছে এলো সবাই রওনা হ'য়ে গেলো উৎসাহে ও উল্লাসে অধীর, কেবল রাজবাড়ির ঝাঁটার কাঠি যে কুড়িয়ে আনে, সেই দুঃখীটা যায় না। রাজা দয়াপরবশ হ'য়ে তাকে সঙ্গে নিতে বললেন মন্ত্রীকে। তারপর:

> মন্ত্রী তাকে ডেকে বললে, "ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখবি চল।"
> সে হাত জোড় করে বলল, "কত চলব। ঠাকুরের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছই এমন সাধ্য কি আমার আছে।"
> মন্ত্রী বললে, "ভয় কী রে তোর, রাজার সঙ্গে চলবি।"
> সে বললে, "সর্বনাশ! রাজার পথ কি আমার পথ।"
> মন্ত্রী বললে, "তবে তোর উপায়! তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা ঘটবে না।"
> সে বললে, "ঘটবে বই কি। ঠাকুর তো রথে করেই আমার দুয়ারে আসেন।"
> মন্ত্রী হেসে উঠল। বললে, "তোর দুয়ারে রথের চিহ্ন কই।"
> দুঃখী বললে, "তাঁর রথের চিহ্ন পড়ে না।"
> মন্ত্রী বললে, "কেন বল তো।"
> দুঃখী বললে, "তিনি যে আসেন পুষ্পক রথে।"
> মন্ত্রী বললে, "কই রে সেই রথ।"
> দুঃখী দেখিয়ে দিলে, তার দুয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্যমুখী ফুটে আছে।
>
> — রথযাত্রা / লিপিকা

তৎক্ষণাৎ ওই মন্ত্রীর মতো আমাদের স্তব্ধ হ'য়ে যেতে হয়। এটা তো কোনো যুক্তিই নয়, প্রমাণ একে কিছুতেই বলা চলে না, কেবল জলন্ত বিশ্বাস-টুকুই অনির্বাণভাবে দপদপ করছে। এর সামনে সব যুক্তি, তর্ক, হাস্য, অবিশ্বাস সমস্তই নিষ্ফল। নিসর্গের প্রতিটি তুচ্ছ বস্তু যার কাছে তাঁরই রথের স্মারক, তাঁরই ভালোবাসার প্রতীক, তাকে কিছু বলারই কোনো মানে হয় না। ওই সূর্যমুখীর মতোই যুগপৎ স্তব্ধ ও মুখর ফুটে থাকে সবকিছু। সেই যে একজনের

কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যে গ্রামের পথে-পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবার সময়, অপূর্ব এক স্বপ্নের মতো, তাঁর সোনার রথকে দেখেছিলো, সেই কৃপণ ভিখারিটির কথা মুহূর্তে আমাদের মনে প'ড়ে যায়। তার সঙ্গে এই রচনাটির জাতের কোনোই তফাৎ নেই, বোঝা যায় একই রক্তের স্রোত দুই রচনার তলদেশেই ফেনিল ও বহমান, ধ্বকধ্বক শোনা যায় একই হৃৎপিণ্ডের শব্দ, উভয় রচনাতেই যা ব্যাকুল স্পন্দমান। প্রাণের সেই একই আকুলতা রং ফুটিয়ে দেয় তার ভিতর, যেন কাকে ডেকে আনবে ব'লে অধীর সমীরণে গন্ধ ছড়িয়ে যায়। পাঠকের কাছে, অমাত্যদের কাছে, অবিশ্বাসীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের রূপকথাগুলি দাবি করে শুধু স্তব্ধতা—ইতিহাস-হারানো ভূগোল-হারানো রাত্রিদিনে সবকিছু যেখানে স্বরূপ উন্মোচন করে, যেখানে কুসুমে-কুসুমে চরণচিহ্ন, যেখানে বিরামহীন শুধু স্তব ও বন্দনা, যেখানে অনবরত শুধু আগমনী।

৩

এ-কথা ঠিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপকথার নানা উপকরণ লোকসাহিত্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। 'বিম্ববতী' তো স্পষ্টভাবেই গ্রিম-কথিত 'তুষারকণা'র কথা ব'লে যায়—তবু যে তা তাঁর নিজের সৃষ্টি হ'লো, তা শুধু এই কারণেই যে সমস্ত ঘটনাকে বর্জন ক'রে তিনি কেবল মানবমনের একটি মৌলিক বৃত্তিকে তার তুঙ্গ চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন—হিংসারি তীব্রতা সর্বনাশ ডেকে আনলো রানীর, সৎমায়ের, তার প্রাণ নিয়ে তবে ক্ষান্ত হ'লো। আর কবিতায় বলা ব'লেই হিংসার এই শাস্তিময় নিষ্ঠুর কাহিনীটি কেবলমাত্র গ্রিমের দোকানের আখ্যান-মাত্র থাকে না। অন্য কারু কাছ থেকে বিষয় বা এষণা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে তাকে বদলে দিয়েছেন। রূপকথার একটি অতিপ্রচল বিষয়বস্তু 'সুয়োরানীর সাধ' নির্ভর ক'রে আছে এরই উপর, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রচনাটি অন্য দিগন্তের সন্ধানী; সমস্ত প্রচলকে ভাসিয়ে দিয়ে এখানে ব'য়ে যায় তাঁর অনুকম্পার স্রোত—যখন তীব্র এক ব্যর্থতা ও বিষাদের বোধ সুয়োরানীকে উদাস ক'রে দিয়ে যায়। যা-যা নিয়ে সন্তুষ্ট আছে দুয়োরানী সব সে নিয়েছে, কিন্তু তবু তার হতাশা কিছুতেই যায় না, সব সময় ব্যর্থ মনে হয় নিজেকে, সবখানে তবু ফাঁক থেকেই যায় আর থেকে-থেকে শুধু লজ্জা লাগে। আর তাই:

“তার পরে আমার কী হল কী জানি।
একলা বসে থাকি। মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধোয়, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই।’
সুয়োরানী হয়েও কী চাই সে-কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারিনে। তাই তোমাকে ডেকেছি, স্যাঙাৎনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, ‘ঐ দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।”
স্যাঙাৎনি গালে হাত দিয়ে বললে, “কেন বলো তো।”
সুয়োরানী বললে, “ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।”

—সুয়োরানীর সাধ / লিপিকা

একদিন ‘খেয়া’র কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছিলো, ‘যে পারে সে আপনি পারে / পারে সে ফুল ফোটাতে।’ এই ঈর্ষাকাতর সুয়োরানীর ভিতর সেই উপলব্ধিটুকু ভ'রে দিয়েই তাকে তিনি ক্ষমা করলেন, করুণা করলেন; প্রচলিত সব রূপকথা এতকাল যাকে নিষ্ঠুর শাস্তি দিতো, ‘বিম্ববতী’র মধ্যে একদিন যাকে তিনি স্বয়ং সুতীব্র মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, এখানে তাকেই তিনি পরমার্থের সন্ধানী করিয়ে দিলেন, দিলেন সমানুকম্পন ও অফুরান বিষাদ।

‘লিপিকা’র এই রূপকথাধর্মী রচনাগুলির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য তাদের সরল ও কৃশ নগ্নতা; ঐকান্তিকতা ও আবেগের চাপে গদ্য আর কবিতা এখানে ভাববিনিময় করে; আমাদের মনে প'ড়ে যায় ইভান তুর্গেনিভ-এর সেই স্বচ্ছ গদ্যকবিতাগুলিকে—কৃশকায় সব দীপ্ত রচনা—ছোট্ট একটুখানি কাহিনী হয়তো আছে, কিন্তু পুরো কাহিনীটিই হয়তো একটি উপমা—সংকেতে তা আলো ফেলে দিচ্ছে নগ্ন ও তন্ময় ভাবনায়—বিশ্বাসে ও দীর্ঘশ্বাসে সমাকুল সচকিত ইশারা যেন। ‘লিপিকা’র সঙ্গে তুর্গেনিভ-এর এই রচনাগুলোর সাদৃশ্য হয়তো নিছক আপতিক নয়; তাঁর ভালো লাগতো তুর্গেনিভ-এর ‘ফুলঝুরি’। কিন্তু রবীন্দ্ররচনার স্নিগ্ধতা ও লাবণ্য অসাধারণ; যদি-বা প্রকরণগত নিরীক্ষার সমর্থন তুর্গেনিভ-এ তিনি পেয়েও থাকেন, বক্তব্য, ভাববস্তু ও ভাষাশিল্পের দিক থেকে তাঁর এই ছোট্ট রচনাগুলো সমস্ত প্রভাবমুক্ত।

স্নেহপরায়ণ এক মনীষা কাজ ক'রে যায় তাঁর রূপকথাধর্মী রচনায়, ক্ষমার

দীপ্তি স্বর্গের আলো ছিটিয়ে দেয় ভালো আর মন্দের উপর। ঠাট্টা আছে অজস্র, আছে কৌতুক ও তির্যক আঘাত, কিন্তু কোনোখানেই তা পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মতো নিষ্করুণ নয়। হয়তো উদ্দেশ্যময় হ'য়ে উঠেছে রচনা, হ'য়ে উঠেছে উপদেশ-গর্ভ ও পরামর্শসম্বল—যেমন হয়েছিলো 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য়। কিন্তু, হয়তো, ছোটোদের কথা মনে ছিলো ব'লেই ভাষা ও ছন্দ ঝলমল ক'রে উঠেছে এখানে, মিলের কৌশল আর ছন্দের চটপটে ভঙ্গি চমকে দেয় বার-বার, ঘরোয়া ও আটপৌরে ভঙ্গিতে যেভাবে তিনি মূল উদ্দেশ্যটি আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন, তা আমাদের মুগ্ধের মতো আটকে রাখে। ক্ষীরোকে তিনি পছন্দ করেননি, কিন্তু তবু তার হৃদয়ে তিনি শুভবুদ্ধির উদয় ঘটান, তাকে তিনি ক্ষমা করেন, তার চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন ঘটাবার জন্য তাকে কোনো ভীষণ শাস্তি দেয়া হয় না, স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই সে বুঝতে পারে নিজের ভুলভ্রান্তি। নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের মনের গড়ন ভীষণ শাস্তির প্রতি পরাঙ্মুখ ছিলো; হয়তো এই অন্তিম ক্ষমা ও আস্থার পিছনে কাজ ক'রে গেছে প্রাচ্যমানস, যেখানে পাপকে অমঙ্গলকে কোনো স্বতন্ত্র ও স্বয়ংপূর্ণ অস্তিত্ব হিশেবে মেনে নেয়া হয়নি। আগেই আমরা এই কথাটি বলবার চেষ্টা করেছি যে হান্স আণ্ডেরসেনের গল্পে সব দোষ-ত্রুটির জন্য ভীষণ শাস্তি তোলা থাকে—দণ্ড ভোগ না-করিয়ে কিছুতেই ভগবানের করুণা দেন না তিনি: ঝলমলে লাল জুতো পেয়ে দেমাকে যে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিলো, কেবল যে তার পা কেটে ফেলা হ'লো তা-ই নয়, এমনকি অনুতাপের অহমিকা ত্যাগ না-করা পর্যন্ত তার মুক্তি হ'লো না; জুতো আর ঘাঘরা বাঁচাবে ব'লে যে-মেয়েটি রুটি মাড়িয়েছিলো, পাতালে দিনের পর দিন দারুণ জ্বালা ও কষ্ট অনুভব করাবার পর তবে আণ্ডেরসেন তাকে মুক্তি দিলেন; 'তুষাররানী'তে তুহিন-ডাইনি সরাসরি পুণ্যের বিরূপ শক্তি হিসেবে উপস্থিত, আর 'ছায়া' গল্পের মধ্যে নির্দোষ বিদ্বানটির ঘাড়ে পড়ে জল্লাদের কুঠার। অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর গল্পে 'সুখ', 'স্বার্থপরতা' এ-সব কথার সংজ্ঞার্থ বদলে দেন সত্যি, বিষাদে ভালোবাসায় জগৎ ভ'রে দেন সত্যি—কিন্তু তাঁর রূপকথার মধ্যেও থামকাই বুকে কাঁটা বিঁধিয়ে গোলাপ ফোটায় কোকিল, তারাঝরা ছেলেটি ভীষণ শাস্তি ও অনুতাপ ছাড়া মুক্তি পায় না, উচ্চাভিলাষী দেমাকি হাউই গিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়ে নোংরা আবর্জনার স্তূপে। এমনকি লেভ তলস্তয় পর্যন্ত লোভী চাষিটিকে অন্ধকার ও পাঁচফুট কবর ছাড়া কিছু দেননি; ছোট্ট আগুনের ফুলকিটুকু সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তবে

ক্লান্ত হয় ; আর এই বিনষ্ট ও জটিল যুগের সব লোকের স্বাস্থ্য ও পরমায়ু তিনি কেড়ে নেন সেই বীজের গন্ধে। বিশেষ অর্থে ধার্মিক তাঁর রচনা, কখনো-কখনো অতিরিক্ত সরলীকৃত, পাপের বেতন মৃত্যু এই খ্রীস্টীয় আপ্তবাক্যটিকে তিনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেননি। রবীন্দ্ররচনাবলি কিন্তু এই ধারণায় কখনও আস্থা রাখেনি ; শেষ বয়েসে যখন তিনি নানা বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও প্রশ্নবিব্রত হ'য়ে উঠছিলেন, তখনও তিনি ক্ষমা করতেই চেয়েছিলেন। 'তোতা-কাহিনী'তে পণ্ডিত ও ভাগিনেয়দের উৎপীড়নে বনের পাখি গানের পাখি যখন সোনার খাঁচায় ম'রে গেলো, তখন অধীর হ'য়ে উঠলো নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়া, আর কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল ক'রে দিলো—কিন্তু রাজা ও তার নিঃসাড় অনুচরেরা কোনো শাস্তি পেলো না। রাজপুত্র যখন কাঠকুড়ুনিকে বিয়ে করলে, তখন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রূপসীরা 'ছিঃ' ব'লে ধিক্কার দিলে ; এই ধিক্কার আসলে আকাশের গায়ে থুতু ফেলার মতো উলটে গিয়ে তাদের উপরে পড়বে সত্যি, কিন্তু তার বেশি কোনো শাস্তি তাদের দেয়া হয়নি—কোনো দারুণ কঠোর অনপনেয় যন্ত্রণা তাদের আজীবন ছিঁড়বে না।

৪

আরো-একটি আশ্চর্য দিক আছে এই রূপকথাধর্মী রচনার।

কালো একটি কাঠকুড়ুনি মেয়ে কেমন ক'রে পরি হ'য়ে গিয়েছিলো, 'লিপিকা'র এই ছোট্ট গল্পটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যখন ধরা দিয়েই কালো মেয়ে মিলিয়ে গেলো হাওয়ায় আর জ্যোৎস্নায়, তখনই ভালোবাসা আর বিরহ আর বিষাদ—হৃদয়ের পরাক্রান্ত জাগরণ—এই সামান্যাকে পরিতে রূপান্তরিত ক'রে দিলে। পুরোনো প্রচলনির্ভর রূপকথায় তার জন্ম দরকার হ'তো জাদু-করা কাচের জুতো কি সোনারুপোর মন্ত্রপড়া কাঠি। লোকসাহিত্যের উপাদান অজস্র ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়ে দেন চকিতে—পদার্থ রূপান্তরিত হয় জাগরণে, বস্তু হ'য়ে ওঠে সংক্রামক কল্পনা। আর সেইজন্যেই রচনাগুলির আত্মীয়তাসম্বন্ধ কবিতার সঙ্গে। সেইজন্যেই এদের মধ্যে ঘটনার সংঘাত কম, পাকানো হয়নি কোনো জটিলঝুরি জট—আর সেই জট খুলিয়ে চমক লাগানো হয়নি—একেবারে সোজাসুজি সরলভাবে তাদের শুরু। প্রতিটি

খুঁটিনাটি, ছোটোখাটো অনুপুঙ্খ, স্নেহেভরা উপমা আর চাক্ষুষ বর্ণনা শেষ অবধি সরলভাবে খুলে দেখায় সবকিছু।

গল্পটার দিকে সোজাসুজি তাকানো যাক। রাজপুত্রকে পরির কথা প্রথম যে শুনিয়েছিলো, সে হ'লো সেই-যে ছিলো নবীন পাগলা। সাংসারিক কাণ্ড-জ্ঞান তার নেই; বাঁশি হাতে সে বনে-বনে ঘুরে বেড়ায়, অন্য দশজন লোকের মতো স্বার্থবশ সে নয়। সেইজন্যেই সে ছাড়া আর-কেউ জানে না পরিস্থানের খবর—না জানে বড়ো-বড়ো পণ্ডিতে, না জানে সাত রাজ্যের সওদাগরের দল। তার ইশারা মেলে না পুথির কোনো পাতায়, সমুদ্র পেরিয়ে সাত দ্বীপ আর তেরো দেশে ঘুরে বেড়ালেও কোনোই ঠিকানা মেলে না তার। নবীন পাগলাই ব'লে দিয়েছিলো, 'তাদের দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো-কখনো যখন চ'লে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।' সে নিজে চেনে কী ক'রে? কখনো-বা একটা সুর শুনে, কখনো-বা একটা আলো দেখে। শেষকালে অবশ্য রাজপুত্র নিজেই জেনে নিতে পারলে, যখন চ'লে গিয়ে পরি আপন পরিচয় দিয়ে গেলো। তার আগে কতদিন গেছে এক-এক ক'রে—জ্যোৎস্না রাতে বিছানায় জেগে উঠে রাজপুত্র চেয়ে দেখেছে বনের মেয়ের ছদ্মবেশে কোথাও একটু খ'শে পড়েছে কি না; দেখেছে যে, কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁত ক'রে খোদা একটি প্রতিমা। আর রাজপুত্র কেবলই ভেবেছে, পরি কোথায় লুকিয়ে রইলো, 'শেষরাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মতো'। জানলো যখন, মস্ত দাম দিতে হ'লো তাকে; বিরহ সরিয়ে দিলে সব আড়াল, বিচ্ছেদ পরিচয়কে সম্পূর্ণতা দিলে।

রূপকথার যে-ধারাটি লোকের মুখে-মুখে চ'লে আসছে, সেখানে ঘুঁটেকুড়ুনি মেয়েরা যখন রাজরানীতে পরিণত হ'য়ে যায় বা নিঝুম পুরীতে জেগে ওঠে জাগরণের কলস্বর, তখন সেই অঘটন সম্ভব হয় কোনো বিশেষ ক্ষমতাসংবলিত কিংখাবের জুতো কি সোনারুপোর কাঠির সাহায্যে—রূপান্তর নির্ভর করে কোনো অসম্ভব বা অসামান্য শক্তিধর বস্তুর উপর—কেবলমাত্র মানুষের কল্পনায় ছাড়া তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো অসম্ভব বস্তুর কথা বলেননি, তিনি বলেছেন বিচ্ছেদ স্মৃতি ও বিষাদের কথা। মালা পরিয়ে দিতেই জেগে উঠলো রাজবালা, কিন্তু চিরকাল তার স্বপ্নে-ঘুমে-মোহে গুঞ্জন

উঠবে, 'কে পরালে মালা? কে জাগালে?' কোনোদিন জানতে পাবে না ব'লেই এই জাগরণ অমন বেদনাময়, বিষাদলীন।

কিন্তু জাগতেও সবাই পারে না, জাগতে জানতে হয়। জানতে হয় ছদ্মবেশ মোচন করতে, আর তারই জন্যে চাই সাধনা। চেনা জিনিশের সত্যিকার পরিচয় পাবার জন্যও সাধনা চাই, তখন প্রতিদিনের পৃথিবীও স্বর্গ হ'য়ে ওঠে—নইলে কোনোকিছুই কখনো সত্যি ক'রে চেনা হবে না। এই সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনীটি লক্ষ করা যাক 'লিপিকা' থেকে।

ছিলো এক তপস্বী, দুঃখের বলে সে জয় ক'রে নিতে চেয়েছিলো স্বর্গ; এমন কঠোর তার তপস্যা যে তাতে এমনকি ইন্দ্র শুদ্ধু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছিলো এক কাঠকুড়ুনি মেয়ে; বুদ্ধদেবকে যেমন সুজাতা সেবা ক'রে যেতো তেমনি সে মাঝে-মাঝে আঁচলে ক'রে তার জন্য ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরনার জল। তপস্যা কঠোর থেকে কঠোরতর হ'য়ে ওঠে, ফল সে আর ছোঁয় না, ঝরনার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়। অথচ একদিন ছিলো যখন এই কাঠকুড়ুনির সঙ্গে দেখা হ'লে স্নেহ ক'রে কথা বলতো নবীন তপস্বী, কত-কি বলতো তার সাধনার কথা, তার নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ সে-সব, সে-কথার মানে বুঝবে কে। কাঠকুড়ুনি বুঝতো না, কিন্তু 'আকাশে নবমেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি' তার মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠতো। এখন তপস্বীর চোখ বুজে গেছে, মুখে কথা নেই, ডেকে কথা কয় না, একটুও ফল-জল গ্রহণ করে না, আর হতাশ হ'য়ে কাঠকুড়ুনি ভাবে সে তবে এখন করবে কী, তার সেবা যে বৃথা হ'তে চললো।

> তারপর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জানতেও পারে না।
> মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে ধ'রে ছায়া ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু, তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।
> কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়ুনি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তবু সে পাহারা দেয়।
>
> —সিদ্ধি / লিপিকা

আর শেষকালে একদিন যখন তপস্যা পূর্ণ হ'লো, ইন্দ্র এসে বললেন, 'স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেছো।'

তপস্বী বললে, 'তাহ'লে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।'
ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাও।'
তপস্বী বললে, 'বনের এই কাঠকুড়ুনিকে।'

—সিদ্ধি / লিপিকা

আমাদের পুরাণে-মহাকাব্যে প্রায় সমান্তর ঘটনার উল্লেখ আছে অনেক। তপস্যায় ভয় পেয়ে গিয়ে দেবতারা পাঠালেন স্বর্গের অপ্সরীদের, ধ্যানভঙ্গ হ'লো, অপ্সরীদের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হলেন তপস্বী। এই গল্প কিন্তু মোটেই তা নয়। কতগুলি অনুপুঙ্খ মিলে যায়, আর সেইজন্যেই পুরাণ-কিংবদন্তির সঙ্গে তার পার্থক্য এত স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ে। বনের মেয়ে যখন তার সেবা ক'রে যায়, তখনই তার ধ্যান ভাঙে না, বরং আরো কঠোর হ'য়ে ওঠে তার তপস্যা – আর যখন সিদ্ধি তার অবশ্যম্ভাবী, চাইলেই পায় স্বর্গ, তখনই সে বেছে নেয় স্বর্গের অধিকারের বদলে এই মেয়েটিকে – না কি পৃথিবীরই স্নেহে-ভালোবাসায় সে স্বর্গকে খুঁজে পায়? এমনিভাবে পুরোনো গল্পের কাঠামোতে ছোটোখাটো দু-একটি বদল ঘটিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ, আর সবটাই হঠাৎ নতুন অর্থে আলো হ'য়ে ওঠে। আমাদের চিরচেনা পৃথিবীই কেমন যেন পালটে যায় তখন – কিংবা আমরা যেন নতুন চোখে চারপাশের জগতের দিকে তাকাতে শিখে যাই। তাঁর রূপকথার জগৎ আর প্রতিদিনের পৃথিবী যে আসলে আলাদা নয়, শুধু ঠিকভাবে দেখতে জানতে হয়, এ-কথা তিনি বলেন নিঃসংকোচে, সরলভাবে, অকুতোভয়ে।

সামনে যেই 'স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো' অসীম সমুদ্র চ'লে এলো অমনি রাজপুত্তুর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লো। 'কিন্তু যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কী হল। এ কোন জাদুকরের জাদু।'

কী আবার হবে? রূপকথার জগৎ আর আমাদের দৈনন্দিন জগৎ পরস্পরের ভিতর অন্তঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে গেলো, পরস্পরে মিলে-মিশে কল্পনা আর বাস্তবের দূরত্ব ও ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলো। মুহূর্তে রাজপুত্রের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরও চোখের উপর থেকে পর্দা স'রে গেলো, আমরাও রাজপুত্রের সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে পেলুম 'স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো' সমুদ্রতীর, অর্থাৎ এই শহর।

এ যে শহর। ট্রাম চলেছে। আপিশমুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম।

তালপাতার বাঁশিওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।
আর, রাজপুত্তুরের এ কী বেশ। এ কী চাল। গায়ে বোতামখোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি ক'রে বাসাখরচ চালায়।
রাজকন্যা কোথায়।
তার বাসার পাশের বাড়িতেই।
চাঁপাফুলের মতো রং নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে-নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে।

—রাজপুত্তুর / লিপিকা

এই রাজপুত্তুর উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলো দৈত্যের হাত থেকে রাজকন্যাকে, কিন্তু ধ'রে রাখতে পারলে না; জাতের মিল ছিলো না ব'লে নিন্দে করলে সবাই; বিচক্ষণ সব উকিল, প্রবীণ সব সাক্ষী ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে দিনকে রাত ক'রে তুললো। যেতে হ'লো তাকে জেলখানার কালো খাঁচায়।

তারপরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এলো। কিন্তু দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপান্তরের মাঠের চেয়েও সে-পথ দীর্ঘ ও সঙ্গীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, "হাঁউমাউখাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।" মানুষকে খাবার জন্যে চারিদিকে এত লোভ।
রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই পথে এসে সে থামলে।
সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।
সেই যমের সোনার কাঠি যেমনি ছোঁয়ানো অমনি এ কী কাণ্ড। শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।
মুহূর্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা। দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।
যুগে-যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়—সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তরের মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে।
ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, সে রাজপুত্তুর।

—রাজপুত্তুর / লিপিকা

এখানেই কি লুকিয়ে নেই 'সে'-র সুকুমারের প্রথম বীজ, ছেলেবেলা থেকেই অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যার অভ্যাস ছিলো ব'লে পরে যাকে উড়োজাহাজের মাঝিগিরি শিখতে দূর বিদেশে চ'লে যেতে হ'লো ; তারপরে তার আর কোনো খবর নেই—এমনকি কোনো চিহ্নই তার রইলো না যা দিয়ে প্রমাণ করা যেতো যে সে কোনোদিন রাজপুত্র ছিলো—না রইলো সেই ভাঙা ছাতা যা আসলে তার পক্ষিরাজ, না রইলো সেই আতশবাজির আধপোড়া কাঠি যা একদিন দিগন্ত শুদ্ধু ঝলমল ক'রে দিয়েছিলো।

সুকুমারেরা বেঁচে থাকে না, তাদের জন্য সোনার কাঠি হাতে কেবল যম নামক দয়াময় দেবতাটিই বেঁচে থাকেন, আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কেবল তাদেরই খবরদারি ও সর্দারি যারা 'টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে'। পৃথিবীতে কেবল তারাই রাজকন্যাকে সরিয়ে নিয়ে যায় যাদের টাকা বিস্তর, দারোয়ান অগুনতি, সেই সঙ্গে যাদের 'বয়সও বিস্তর, আর নাতিনাৎনির সংখ্যাও অল্প নয়'। আর খুড়োরা মন্তব্য করেন, 'মেয়ের কপাল ভালো'। আর থাকে বিচক্ষণ সব উকিল, প্রবীণ সব সাক্ষী, যাদের ভোজবাজিতে দিন হ'য়ে যায় রাত, আর শেষকালে প্রমাণ হয়, 'কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম এখনো জেগে আছেন'। অর্থাৎ থাকে কেবল 'তোতা-কাহিনী'র ভাগ্নেরা ; থাকে রাজপণ্ডিত, স্যাকরা, নকলনবিশ, কোতোয়াল প্রভৃতি, আর থাকে বেচারি নির্জীব মৃত পাখি যার পেটের ভিতর পুঁথির শুকনো পাতা খশখশ করে। বন্ধ হ'য়ে যায় লাফঝাঁপ, আকাশ-ওড়া, গান, কলরব—শুধু থাকে মুকুলিত বনের আকাশে বসন্তের আকুল হাওয়া আর কিশলয়ের দীর্ঘশ্বাস।

৫

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ধীরে-ধীরে এক গোপন প্রক্রিয়ায় 'সে', 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প' প্রভৃতি শেষ বয়েসের রচনার উপাদানগুলি কোনো রহস্যময় খনির ভিতর বেড়ে উঠছে, জমতে থাকছে : এখন আছে পাথরচাপা, কিন্তু একদিন ঢাকা খুলে যাবেই। যেতে বাধ্য।

বিষয়বুদ্ধি, স্বার্থবোধ, মিথ্যাচার—সংসারের এ-সব রাক্ষুসে দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন, কিন্তু অরুচিকর ঠেকতো ব'লে

তাদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি লড়াই শুরু হয়নি—শুধু বিরাগ আর অনীহাই প্রকাশ ক'রে এসেছেন এতকাল। আর যেহেতু তাঁর মূল অনুভব ছিলো করুণা ও অনুকম্পার, সেইজন্যই এই স্বার্থবশ দারুণ জগতে চিরকালের ঘরছাড়ার চিরকালের রাজপুত্তুরের কী দুর্দশা ঘটে তাই শুধু খুলে দেখিয়েছেন। কিন্তু এক সময় মনে হ'লো, শুধু এটুকুতেই তাঁর দায়িত্ব ফুরোয় না। তাঁর অসম্ভাবনার গল্পে-কবিতায় তাই নতুন দায়িত্বের স্বীকরণ ঘটলো—নাম কাম আরামের প্রতিবাদে তাই এই বইগুলির পাগল মানুষগুলো উন্মুখর।
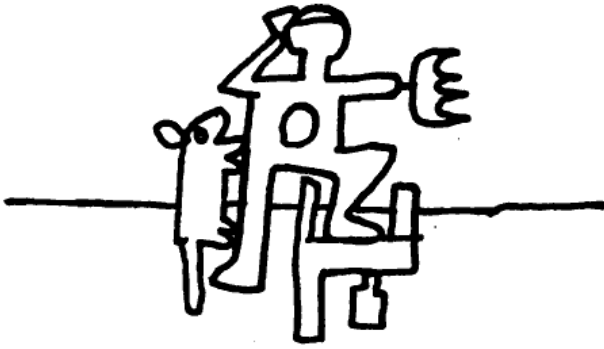
আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ।

অসম্ভব গল্পেরই যে ফর্মাশ।

হোক-না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে সে বানাতে পারে। —সে / ৪

১

এটা ভাবতে অবাক লাগে যে 'সে', 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প' এইসব বই রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে লিখেছিলেন। কিছুদিন আগেই 'কল্লোল'কালীন সাহিত্যিক বিদ্রোহকে তিনি তির্যকভাবে ঠাট্টা করেছেন 'শেষের কবিতা'য় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নিবারণ চক্রবর্তীর বেনামিতে এক বিলেতফেরৎ ছোকরা উকিলকে, আর তার মারফৎ এমনকি নিজের হাতের লেখার নরম মোলায়েম নমনীয় সুগোল ছাঁদের বদলে সোজাসুজি কাঁটা-ওঠা কোণ-তোলা খোঁচা-লাগা তীক্ষ্ণ, ঋজু, সরল ছাঁদকে পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধা করেননি। সত্যি যে নিজের বিপক্ষে ওকালতিটা খুবই জমকালো ও সপ্রতিভ হয়েছিলো, উকিলের বুকনি এতটাই ঝিলিকলাগানো ছিলো যে তৎকালীন তরুণদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো, তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। কোনো-কোনো অবলোকন সত্যি খাঁটি ছিলো সেখানে – কিন্তু পুরো বইটার পরিকল্পনায় ঠাট্টা বা কৌতুকও নেহাৎ কম ছিলো না। তরুণ লেখকদের প্রতি একদিক থেকে নির্মম বিদ্রূপ ব'লেই মনে হয় 'শেষের কবিতা'কে, যদি অমিত রায় ওরোফে নিবারণ চক্রবর্তীকে তরুণ কবিদের প্রতিভূ ব'লে গণ্য করি। রবীন্দ্রনাথের কাছে হয়তো তথাকথিত বিদ্রোহটি ছেলেমানুষি ও চালিয়াতি ঠেকেছিলো, হয়তো এই সাহিত্যিক বিদ্রোহটি নিছকই ছেলেছোকরাদের ফ্যাশন ব'লে তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই সময়তেই রচিত হয়েছিলো তাঁর জীবনের নিষ্ঠুরতম উপন্যাস : 'মালঞ্চ'। আরো : 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটির ঝুরি-নামা বটগাছের তলায় উন্মোচিত হয়েছিলো এক রুদ্ধশ্বাস ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবী – স্বভাবকে হত্যা করার এই ভীষণ নাটক সেখানে রক্তাপ্লুত শেষ হয়েছিলো। আর এই সময়েই তাঁর রগরগে চিত্রকলা ছায়ায়-আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছিলো ভৌতিক এক ভূদৃশ্য, যার সমান্তর

হ'লো বোধহয় এক আদি পৃথিবী, যখন পৃথিবীটারই সত্যি-সত্যি পুরো তৈরি হ'তে বাকি, পুরো ঠাণ্ডা হ'তে বাকি – হাজার মুখে গিলে উগরে যা তখন ধাতস্থ হবার চেষ্টা করছে : প্রবল সব জ্বলজ্বলে রং ডাইনির চোখের মতো স্থির তাকায়, কঠিনবঙ্কিম তেরিয়াদারুণ সব রেখা, তাদের হিংস্রভীষণ চীৎকারে যেন জাদুবিস্তার ঝোড়ো মন্ত্র। যুগপৎ সব দিক থেকে তখন যেন এই প্রতিদিনের পরিচিত এই আইনমানা, বাধ্য, বশংবদ, আপোশে-চলা হেঁ-হেঁ জগৎটিকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন তিনি। তখনকার অনেক লেখায় দেখা যায় ঠাট্টা টিটকিরি টিপ্পনী – কখনো-কখনো রুষ্ট বিদ্রূপ এমনকি, যাতে এই হিংস্র হাসিই ভণ্ড দৈনন্দিনকে বাতিল ক'রে দিতে পারে। তিনি কি তখন সব প্রচলনের অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন? তাকেই কি তিনি মারাত্মক আঘাত হানতে চাচ্ছিলেন এমনিতে যাকে বাস্তব ব'লে থাকি, তথাকথিত বাস্তব, তথ্যপূর্ণ ও তথ্যাহত, যেখানে যত রাজ্যের যুক্তিতর্ক হিশেব-শৃঙ্খলার প্রাণঘাতী আধিপত্য?

এই প্রশ্নটার উত্তর সহজ হয় না, জল্পনা ক্রমশ বেড়েই চলে, যখন ভাবি যে প্রায় সমসাময়িক কালেই তিনটি 'মহীয়ান আজগবি' রচনা করেছিলেন তিনি – 'সে', 'খাপছাড়া', আর 'গল্পসল্প'। সময়ের দুই কালো হাত একই জায়গায় এদের এমনভাবে ঠেশে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে দেখে অবাক হ'তে হয়। কেননা মূলত এক তীব্র প্রতিবাদে এই তিনটি শিশুসেব্য গ্রন্থও উন্মুখর – আর 'শিশুসেব্য' কথাটিও এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ ঠেকে। অনেক রসিকতা, অনেক লক্ষ্যভেদী পরিহাস, অনেক প্রসঙ্গ অত্যন্ত বয়োপ্রাপ্ত ও উদ্দেশ্যময়। খুব-একটা মোলায়েম নয় বইগুলো, আর ছোটোদের জন্য কোনো-কিছু পাৎলা বা তরল ক'রে বলা কোনোকালেই তাঁর ধাতে ছিলো না – তাঁর মেজাজ বা মনের ভঙ্গি কখনো পালটাতো না, বইগুলো যতই কেননা শিশুপাঠ্য ব'লে বর্ণিত হোক। তাছাড়া কেউ কি সত্যি পারেন সমসাময়িক কালে প্রণয়ন-করা বিভিন্ন রচনায় নিজেকে ভিন্ন-ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করতে। তখন ছবি আঁকছেন তিনি, হানা-দেয়া হানা-লাগা সেই ভৌতিক ছবিগুলো, গল্প-উপন্যাসের প্রসঙ্গ হ'য়ে উঠছে নির্মম ও রক্তাপ্লুত, তখনকার কবিতায় চিত্রকল্পও যেন কি-রকম পরিবর্তমান। কিছু পরেই লিখবেন 'সভ্যতার সংকট' – তাঁর শেষ অভিভাষণ। কাজেই এই সময়কার শিশুপাঠ্য বইগুলোও যে অন্যরকম হবে, তাতে বিচিত্র কী। কখনোই ছোটোদের লেখাগুলোয় নিজেকে তিনি বিকৃতভাবে উপস্থাপিত

করেননি, ছোটোদের কখনো তাঁর মনে হয়নি নিছক অপোগণ্ড ও নিঃসাড়, নির্বোধ ও কল্পনাবিহীন। কাজেই উপরিউক্ত বই তিনটিতেও তাঁর অস্থিরতা, অসহিষ্ণু তীব্রতা, তাঁর নিজের মধ্যকার সংকট সব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

তথাকথিত যুক্তিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে তেজিয়ানভাবে দাঁড়িয়ে আছে বই তিনটি। দুটি বই আবার স্বচিত্রিত – হিংস্রজাতের কাঁটাওয়ালা দাঁত-বার-করা আমিষখোর ঘণ্টাকর্ণর মতো জীব যেমন সেখানে ওৎ পেতে আছে, তেমনি আছে চেনা মানুষের মুখের ভিড়ে অদ্ভুত সব মুখোশের আদল, টানেটোনে রহস্যময় সব মানসবৃত্তির ইঙ্গিত, রঙের মধ্যে প্রবলতেরিয়া অস্থিরতা। কী এরা? 'প্রতিভাবানের খেয়াল'? 'অবসরকালের আত্মবিনোদন'? 'চিরচেনা রবীন্দ্রনাথেরই নতুনতর একটি ভঙ্গি'?

ভঙ্গিটি – যদি ভঙ্গি কথাটা ব্যবহার করতেই হয় – যে নতুনতর, তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু নিছকই কি অবসরকালের আত্মবিনোদন? শুধু মাত্রই প্রতিভাবানের খেয়ালখুশি? মোটেই তা নয় – রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখন এগুলি না-লিখে কোনো উপায় ছিলো না। এইভাবেই নিষ্কাশিত করতে হয়েছিলো সব তাপ, নিরর্গল ক'রে দিতে হয়েছিলো সব কপাট – বাধ্যতা ছিলো ভিতরকার, ছিলো ক্ষমাহীন দাবি। একবার তাঁকে শৈশবসাধনা করতে হয়েছিলো মুক্তির জন্য, মার্কিনমুলুকের রাক্ষুসে বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলেন, 'বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি ক'রে'। দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছিলো কুশ্রী দেয়ালের অভ্যন্তরে, তাই অবাধ আকাশকে খুঁজেছিলেন শৈশব-কল্পনায়। তারও আগে আরেকবার মাতৃহারা শিশুদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে নিজের শৈশবকে তৃষিতের মতো পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছিলেন, দুর্বল রোগী যেমনভাবে শান্ত সন্ধ্যাবেলায় বাটির দুধ আকণ্ঠ পান ক'রে চায় পুষ্টি আর হৃত স্বাস্থ্য। জীবনে কখনোই এমন-কিছু তিনি রচনা করেননি, যা প্রয়োজন থেকে উত্থিত হয়নি।[১] অজস্র লিখেছেন ফরমায়েশি – এটা ঠিক; কিন্তু ফরমায়েশি হ'লেই যে স্ববিরোধী হবে, এমন কোনো কথা নেই – যাকে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী মনে হয়, সে-ফরমায়েশ মেনে চলার সত্যি তো কোনো দায় নেই। আসলে যখনই নিজের জন্য কোনো-

১ আর, 'সেই শিল্পই হচ্ছে উৎকৃষ্ট যা উত্থিত হয়েছে প্রয়োজন থেকে', কোনো তরুণ কবির কাছে লেখা রাইনের মারিয়া রিলকের এই চিঠির 'প্রয়োজন' কথাটি নিশ্চয়ই অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।

কিছু জরুরি ব'লে মনে হয়েছে তাঁর, তখনই তা-ই করতে চেয়েছেন—বিভিন্ন সময়ে তাঁর মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী মনোভাব কাজ ক'রে গেছে তার কারণও তো এটা। একবার যে রসিকতা ক'রে বলেছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ স্ববিরোধ সবচেয়ে বড়ো দোষ স্ববিরোধ, এই কথাটা প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে। কাজেই, জীবনের শেষ দিকে, তাঁর চিত্রকলার মধ্যে যে-সব পাথরচাপা মনোভাব ঝাঁকুনি দিয়ে, লাফিয়ে, পিঠ বাঁকিয়ে, কাঁধ ঝাড়া দিয়ে বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চাচ্ছিলো ছোটোদের এই বইগুলির মধ্যে তারা জোর ক'রে নিজেদের জায়গা ক'রে নিলে—রুষ্ট বিদ্রূপ আর রক্তাপ্লুত কৌতুকে রচনাগুলি কেমন যেন তীব্র হ'য়ে উঠলো।

তা-ই যদি না হবে, তাহ'লে কেন লিখেছিলেন 'ধ্বংস' নামে গল্প ও তারই পরিপূরক কবিতা, যার ভিতর রাগ, ক্ষোভ ও ঘৃণা অস্থিরভাবে ফুটে উঠেছে, যার মিল কেবল তাঁর চিত্রকলায় আর শেষদিকের নৃত্যনাট্যে। যে-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আস্তিক্যবুদ্ধি উত্তরকালকে অনেক সময় ঈর্ষাতুর ও বিচলিত করেছে, তা এখানে এই ছোটোদের জন্য লেখা গল্পটিতে অন্তর্হিত : উটের পিঠে যেন শেষ খড়, সর্বগ্রাসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে তিনি এইভাবেই দেখেছিলেন :

সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কল বল সম্বল সিভিলাইজেশনের
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেয়া পশুরে।
মানুষকে ভুল ক'রে গড়েছেন বিধাতা,
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।

— ধ্বংস / গল্পসল্প

২

সিধে ক'রে দেবার জন্যই যেন অসম্ভবের ব্যাকরণ রচনা ক'রে বসলেন তিনটি বইতে। দেখিয়ে দিলেন এমন-এক 'হাস্যকর' পৃথিবী যার ভিতর আমাদেরই দৈনন্দিন জগতের স্পর্শসহ প্রতিবেদন ওলোটপালোটভাবে বিদ্যমান। 'খাপছাড়া'

তো যেন সোজাসুজি একটা বিদ্রোহের বই। যা-কিছু সৃষ্টিছাড়া, উদ্ভট, বেয়াড়া, মাত্রাতিরিক্ত, তারাই দলে-দলে ভিড় ক'রে এলো এখানে। 'গল্পসল্প'তে কথক দাদুটির আশপাশে তাদেরই ভিড় জমলো, সাংসারিক সুবুদ্ধি যাদের পাগল বলে। যা-কিছু আইনমানা, আপোশে-চলা, নিক্তিমাপা, মধ্যবিত্ত, নামহীন, সেই 'সে' যেন তারই মূর্তিমান প্রতিবাদ। আর সবকিছুর অন্তরাল থেকে ডুকরে-গাওয়া গানের ধুয়োর মতো কেবল বোঁচা গোঁফের হুমকি শোনা যেতে লাগলো, গলা-কাটার ধুম প'ড়ে গেলো দেশে-বিদেশে, গ্রামে-শহরে। লৌকিক ছড়ার ছেলে-ভোলানো তালের মধ্যে ফুটে উঠলো আবহমানের লোকযাত্রার বিবরণ—আর সেই সব সহজসরল সাধারণ লোকের প্রাত্যহিকতার মধ্যেই ভীষণ বেতারে ক্রমাগত খবর আসে কোথায় বোমা প'ড়ে তলিয়ে গেলো জাহাজ, কোথায় মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিলো সভ্যতার বুনিয়াদ, যা শুনে খাঁচায় পোষা চন্দনাটি কেবল থপ ক'রে ফড়িঙ ধ'রে-ধ'রে পেট ভরায়।

> গ্যাঁগোঁ করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত—
> মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।
> টিয়ের মুখে বুলি শুনে হাসছে ঘরে-পরে—
> রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
>
> — ছড়া / ৬

হিংস্র হ'য়ে উঠেছে তাঁর রচনা, ভীষণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা। এই প্রথম যেন মহাকবির করুণাও মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হ'লো। 'সভ্যতার সংকট' অভি-ভাষণের মধ্যে যে মনের প্রকাশ, এখানে তারই উগ্র ও উচ্চণ্ড অনুরূপ। রাগে, ক্ষোভে, অসহায় আক্রোশে এমনকি 'ছোটোদের জন্য উদ্দিষ্ট' বইতেও বারংবার প্রতিবাদে তিনি ফেটে পড়লেন। এই বিষয়ে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি পর্যন্ত উত্তেজনায় কম্পমান :

> আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
> কলম আমার বেরিয়ে এলো বহুরূপীর বেশে।
> আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
> আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শ্যাওলাঘেরা নায়ে।
> কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড় পুতুলের বিয়ে,
> বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে।...

আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয় দানোয় পাওয়া।

— ছড়া / ৬

যেহেতু তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই জন্যই প্রতিবাদ না-করা তাঁর অসাধ্য ছিলো। মৃত্যুর মাত্র কিছুকাল আগে লেখা এ-সব : বিচলিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ, অশান্ত, স্বস্তিহীন ;—সারা জীবন যা ভেবেছেন, যা ছিলো তাঁর ধ্যানের আর আরাধনার —সব যেন ধ্বংস হ'য়ে যেতে বসলো। তাই হরবোলার মতো তিনি বেরিয়ে এলেন, গলায় নতুন কণ্ঠস্বর। তিনি নিজে বলেছেন 'কলম আমার বেরিয়ে এলো বহুরূপীর বেশে'। সিন্ধুপারে যে-ওলোটপালোট কাণ্ড চলেছে, সুরাসুরের যে-প্রবল সংঘর্ষ, সেই মন্থন ও উল্লম্ফনের চিত্র রচনা করলেন তিনি, আর উপায় হিশেবে বেছে নিলেন আবোলতাবোলকে—তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর কুশীলবেরা উলটে-পালটে ডিগবাজি খেয়ে গেলো, ঠাট্টায় কৌতুকে বিপর্যস্ত হ'লো—আর, একদিক থেকে, হ'য়ে উঠলো তাঁর অসহিষ্ণু প্রতিবাদের তির্যক দলিল।

৩

এই কথাটা বিশদ করার যোগ্য।

যন্ত্রযুগের সূচনায় ইওরোপে যখন মানুষকে কতগুলি যোগ-বিয়োগের সংখ্যা বা শতরঞ্চ খেলার ঘুঁটি বানিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছিলো, তখন সাহিত্যের সকল বিভাগেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠেছিলো ব'লে একটা প্রচলিত মত আছে, যার সবটাই হয়তো উড়িয়ে দেবার মতো নয়। যে-ভীষণ পার্থিবতা গোটা ইওরোপকে কুক্ষিগত করতে চাচ্ছিলো, তার বিরুদ্ধে চীৎকার উঠেছিলো যেন—'সব মানুষকে এক ছাঁচের ক'রে দাও', যন্ত্রযুগের এই ভয়ানক আব্দার কবি-শিল্পীরা কেউ মানতে চাননি। পোশাকের ছাঁট কি জুতোর ডগাই যে মানুষের সর্বশেষ পরিচয় নয়, কেবলমাত্র মানুষের বেলাতেই যে সরল পাটিগণিতের নির্বস্তুক মতামত সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়—এই কথাটাই তৎকালীন শিল্পকর্মের ভিতর তীব্রভাবে ফুটে উঠেছিলো। কলে-ছাঁটা সমাজে-আঁটা মানুষ—এই সর্বনেশে ধারণার বিরুদ্ধেই 'মহীয়ান আজগবির' তির্যক বিদ্রোহ। আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে 'খেয়ালি' কল্পনার এই বঙ্কিম প্রতিবাদ তাৎপর্যপূর্ণ। যা-কিছু সরলীকৃত

ও গতানুগতিক, যা-কিছু গড্ডলপ্রবাহ ও প্রচলনির্ভরতার স্মারক, অর্থাৎ আরামপ্রদ, নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার, কেবলমাত্র রতিসুখ, অর্থবিত্ত ও যশাকাঙ্ক্ষায় ভরপুর, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একদল বেপরোয়া লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিলো আমাদের ; প্রচলিত অর্থে যারা পাগল স্বেচ্ছাচারী ও কাণ্ডজ্ঞানরহিত, সংসার যাদের বলে উদাসীন, ভাবুক ও মাথাখারাপ, যারা কোনো যুক্তিশৃঙ্খলা বা ব্যাবহারিক বুদ্ধির তোয়াক্কা রাখে না, অন্যদের সহস্র মুখনাড়া, ভ্রূকুটি ও ঠোঁট বেঁকানোতে যারা পেছপা হয় না বরং একরোখা জেদে ভ'রে থাকে — তাদের কথাই বলা হয়েছিলো লুইস ক্যারল আর এডওয়ার্ড লিয়ারের আবোলতাবোলে।[২] এই পার্থিব আইনকানুনে কিছুই চলে না আয়নার মুলুকে, কিংবা আজব দেশে, কিংবা আষাঢ়ে জগতে : সব নিয়মের বেড়াজাল সেখানে লাফিয়ে-পেরিয়ে-যাওয়া, প্রচলিত ব্যাকরণের সব সতর্কতা সেখানে লঙ্ঘন করা, আমাদের চিরচেনা জগৎ সেখানে উলটো কানুনে ডিগবাজি খায়।

সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ কি পরিমল রায় — বাংলাদেশের এই তিনজন কবি বিভিন্ন সময়ে একদিক থেকে এই অসম্ভাবনারই আরাধনা করেছিলেন। তাঁদের রচনার ভিতরেও পাওয়া যায় বিদ্রোহের এই মরিয়া চীৎকার — প্রত্যেকের প্রহসনেই নিজস্ব কতগুলি মার্কা আর চিন্তা আছে, কিন্তু তবু হয়তো মূল তাৎপর্য এমনতর তির্যক। সুকুমার রায়ের আবোলতাবোলে শশব্যস্ত ও মগ্ন সব অ-সাধারণ ব্যক্তিত্বের ভিড় — তাদের কেউ ছায়া-ধরার ব্যাবসা করে, কারু-বা খুড়োমশায় দূরে-যাবার এগিয়ে-যাবার এক আজব কল বানান, কেউ-বা একা-একা সাত জার্মানের সঙ্গে লড়াই ক'রে পটোল তোলে ; সেখানে আছে মাত্রই দুটি ল্যাজ ব'লে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিমর্ষ হ্যাংলা লোক, হাসির ভয়ে মোহ্যমান রামগরুড়ের ছানা, জোচ্চুরি বন্ধ করবার জন্য ঢাল-তরোয়াল নিয়ে তৈরি স্বয়ম্বশ গোয়েন্দা — যার পশ্চাদ্দেশে কোনো চক্ষু নেই, আর সর্বোপরি আছে সেই সনাতন ও নামহীন বালখিল্য যে এমন সাপ চাচ্ছে যে আসলে সাপই নয়। সেখানে আইনকানুন সর্বনেশে এবং একবিংশতিবিশ ; সেখানে এমনকি সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে এক বদ্যিবুড়ো রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে। সব উলটো চালের কারবারের মাঝখানে এ-রকম একটি চিরচেনা লোকও মুহূর্তে কেমন উদ্ভট ব্যক্তিত্বের পরাকাষ্ঠা হ'য়ে

২ এডওয়ার্ড লিয়ার : আষাঢ়ে বই ; অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; কলকাতা ১৩৭৭

যায়। পরিমল রায়ের বিশ্বেও এই একই উলটো নিয়ম রাজত্ব ক'রে চলেছে; সেখানে বউকে নৌকো থেকে ঠেলে ফেলে দেয় সদ্যবিবাহিত বর; গুলি মেরে মা-বউয়ের মাথার খুলি উড়িয়ে দিলে বাবামশাই সেখানে পিঠ চাপড়ে এই ব'লে তারিফ করেন, 'ভাগ্যিশ এক গুলিতেই শাবাড় হ'লো, না-হ'লে মজা দেখাতুম —কেননা গুলি আজকাল যা মাগ্যি'; আর বিবাহ অনুষ্ঠানের সূচনায় দুই পুরুতে পাণ্ডিত্যের ঝগড়া বাঁধে আর লগ্ন শেষ হবার সময় বরের ভুরুতে গাঁট্টা ঘনায়। নিষ্ঠুর জগৎ সন্দেহ নেই; হের ডকটর জিগমুণ্ড ফ্রয়েডের শাগরেদরা চাই কি স্যাডিজ্‌ম্‌-এর পরাকাষ্ঠা দেখতে পারেন এ-সব ছড়ায়; কিন্তু এই নিষ্ঠুর নির্মম জগতের সবকিছুই চলেছে উলটো চালে—না কি আমাদের সব কাণ্ডজ্ঞানই উলটোভাবে এ-সব ছড়ায় সুপ্রযুক্ত। অবনীন্দ্রনাথের অনেক লেখাতেও এই ধরনের অদ্ভুত কিম্ভূত ও সৃষ্টিছাড়ার দেখা পাওয়া যায়—অনেক গল্পেই পাওয়া যায় সেই চরিত্রটিকে যার নাম অবু; আর 'পথে-বিপথে'তে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে পাওয়া যায় দু'জন লোকের ক্রিয়াকলাপ: একজন অবিন, অন্যজন তারই কাণ্ডকারখানা ছাখে আর অবাক হয়—তার নাম অবু। লিয়ারের 'আপাতলঘু পঞ্চপদাবলি'তে দর্শক ছিলো 'they' বা অন্যেরা—অবনীন্দ্রনাথ আরেক ধাপ এগিয়ে এসে এই they বা দর্শকদের নিজেরই অন্য সত্তা ক'রে দিলেন। সব সরলীকরণ ও সমীভবনের বিরুদ্ধে এটা একটা তীব্র প্রতিবাদ সন্দেহ নেই, কারণ তিনি প্রকাশ করেছেন মানুষের সেই দোটানাই—বিদ্রোহ ও মেনে-চলা, একই সঙ্গে এই দুই বোধের দ্বন্দ্ব অবিরাম মানুষের মধ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

তিন জনের মধ্যে মিল আরো আছে। তিনজনই যুগপৎ শিল্পী আর কবি: শুধু মাত্র হাস্যরসের ছোটো গণ্ডির মধ্যে, তাঁদের কিছুতেই এঁটে রাখা যায় না। যে-তিনটি বইতে রবীন্দ্রনাথের হাতে অসম্ভাবনার ছন্দটি নিপুণ-ও সচেতন-ভাবে বেজেছিলো, তার দুটির মধ্যেই অসংখ্য ছবি আছে উপরি পাওনা—আরেকটিতে আছে সম্পূরক ও পরিপূরক কবিতা। এই বিচিত্র ও প্রচণ্ড চিত্র-শালা অসংবরণীয়ভাবে তাঁর সেই সময়কার মেজাজকে খুলে দেখিয়েছে আমাদের। সত্যি-যে অন্য তিনজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক তফাৎটিও এ-সব ছবি-ছড়া ও গল্পে সুপ্রকাশ ও স্বপ্রকাশ, কিন্তু এটা ঠিক যে সকলের লেখাই বিভিন্ন বয়েসের বিভিন্ন পাঠক ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে উপভোগ করতে পারেন—এ-সব লেখা একবার পড়লেই ফুরিয়ে যায় না, সারা জীবনের আমুদে সঙ্গী হয়।

৪

বেশির ভাগ লোকই ধরাবাঁধা ছককাটা একটা গণ্ডির মধ্যে গোটা জীবনটা কাটিয়ে দেয়। আমাদের সাংসারিক জীবন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, দৈনন্দিন ভাবনাচিন্তা সবকিছুই কমলাপুলির টিয়ের মতো বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে। এমনকি যখন দিনরাত ভূতে-পাওয়া, জলবায়ু অস্থির, পাণ্ডারা পাশবিক আর মেশিনগানে সভ্যাবিধির ভিৎ গুঁড়িয়ে যায়, তখনও সকলে খাঁচার পাখির মতো রাধাকৃষ্ণ বুলি আওড়ায়। শৈশবের পর থেকেই প্রক্রিয়াটির শুরু—কৌতূহল, বিস্ময়, আকস্মিক—সব তারপর ম'রে যায়: ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে না-তাকিয়ে উন্নতি, চাকরি, পরচর্চা ইত্যাদির বাঁধা সড়ক ধ'রে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দেয়াই অভীষ্ট হ'য়ে ওঠে—প্রতিটি দিনই ভাঙা রেকর্ডের মতো বিগত দিনের পুনরাবৃত্তি করে—হ'য়ে ওঠে যান্ত্রিক, একঘেয়ে, স্নায়ুপীড়ক। রতিসুখ, অর্থবিত্ত, যশাকাঙ্ক্ষা—এ-সব আফিম যে ক্রমেই নিস্তেজ ও নির্জীব ক'রে ফেলছে, এই বোধটি পর্যন্ত হারিয়ে যায়।

এরই ভিতর কোনো-কোনো লোককে যদি এই গণ্ডির বাইরে যেতে দেখি, তাহ'লে তাদের আমরা বলি পাগল—সংসার তাদের খ্যাপা ও অকেজো ব'লে বাতিল ক'রে দেয়। কড়া ইস্ত্রি-করা ধোপদুরস্ত জামাকাপড়-পরা ভদ্রলোক মাত্র হওয়াই কি জীবনের শেষলক্ষ্য ও সার্থকতা? ওই কোঁচা-লোটানো ধোপদুরস্ত জামাকাপড়-পরা লোকটি নতুন-কিছুই নয়, সমাজের সবাই ওইভাবে নিজেকে প্রকাশ ক'রে থাকে, বেশভূষার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সে মোটেই ফুটিয়ে তুলতে পারেনি, ওটা কেবল তার মলাট, প্রচ্ছদ মাত্র, নিছকই একটি আবরণ—সামাজিক ছককাটা রীতিতে সে আগাগোড়া মোড়া। আসলে মানুষ যখন কোনো-কিছু অবলম্বন ক'রে নিজেকে ফুটিয়ে তোলে তখনই সে হ'য়ে ওঠে দর্শনীয়—তাতে সংসার তাকে ছিটগ্রস্ত কি মাথাখারাপ বললেও কিছু এসে-যায় না। হামেশা দেখছি, রোজ চারপাশে যা ঘ'টে যাচ্ছে, তার কোনো আকর্ষণই নেই। স্বাভাবিকের বহির্দ্বারেই অসম্ভাবনার চমকলাগানো বিস্ময়কর জগৎ। অর্থাৎ:

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই—
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।
নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি
জগতের ইস্কুলে তবে পাই ছুটি।...

দুইয়ে-দুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছ্বাসে
একেবারে চ'ড়ে বসে উনপঞ্চাশে,
ভুল, তবু নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই ;
পাঁচে-সাতে পঁয়ত্রিশে কোনো মজা নেই।
মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনোখানে,
কবিরা শুনেছি তারি রাস্তাটা জানে—
তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের
দোকানেতে তাই জোটে এত খদ্দের।

—ম্যাজিশিয়ান / গল্পসল্প

'গল্পসল্প' 'খাপছাড়া' ও 'সে' এই ম্যাজিকের জগতেরই গল্প-কবিতা, আর তাই এখানে এমন কয়েকজন অদ্বিতীয় লোকের জীবজন্তুর দেখা পাওয়া যায়, স্বভাবের পৃথিবী যাদের প্রতি বিরূপ ও প্রতিকূল—কিংবা স্বভাবের পৃথিবীতেই হয়তো যারা থাকে না ; সামাজিক জীবনে আমরা যাদের সঙ্গে চেনাশোনা করতে চাই না, বরং যাদের সন্তর্পণে এড়িয়ে চলি ও পারতপক্ষে যাদের ধারে-কাছে ঘেঁষি না, তাদেরই জোটানো হয়েছে এই তিনটি বইতে। 'খাপছাড়া' ও 'সে' অকৃপণভাবে চিত্রিত—এই তীক্ষ্ণ-উজ্জ্বল চিত্রশালায় কোনো-কোনো মানুষের ও জীবজন্তুর ছবি ও মুখের ভাবটুকু শুদ্ধু এতটাই জীবন্ত যে মনে হয় বইয়ের পাতা থেকে তারা দুমদাম ক'রে লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে। মুখের আদল ও ভোলের মধ্যে নানা চেনা-অচেনা প্রাণী ও জিনিশের আভাস—আর তার ফলেই সব কেমন বিচিত্র ও অদ্ভুত ঠেকে। 'গল্পসল্প'তে এই ছবির স্থান পূরণ করেছে কবিতা। গদ্য-পদ্য যে-ভাবে মিলে-মিশে গেছে, তাতে এ ওকে ভরাচ্ছে, ও একে ফোটাচ্ছে, গল্প আর ছন্দ মিলে তবেই রচনাগুলো সম্পূর্ণ হয়েছে। 'সে'-র জলে ডুবে মরার গল্প, বাঘের গল্প, শেয়ালের মানুষ হবার গল্প, 'সে-'র মাথায় বন-মানুষের মগজ ঠুশে দেবার গল্প, গেছো-বাবার গল্প—কোনোটাই নিছক খাম-খেয়ালির নিদর্শন নয়, যদিও তারা অসম্ভবেরও সীমা পেরিয়ে গেছে। কারণ এই খামখেয়ালের আড়ালেও চাপা ও লুকোনো অর্থের ঝিলিক দেখা যায় অনবরত। আর 'গল্পসল্প'র ভিতর তেমনিভাবে আছে খ্যাপাদের ভিড়। নীলমণিবাবু, চণ্ডী, মুনশিজি, হ. চ. হ., বাচস্পতি—কত নাম করবো? কেউ কারু চেয়ে কম যায় না, আর কারুই কোনো তুলনা নেই। লিয়ারের ছবিতে ও লেখায় যেমন যত-সব কিম্ভূত ও অদ্ভুতের রাজত্ব, তেমনি এরা ; সামাজিক বুদ্ধি

এদের তুচ্ছ করে, দুয়ো দেয়, হাসিঠাট্টা করে, হাততালি বাজায়, ধর্তব্যেই আনে না—কিন্তু প্রত্যেকেই অসামান্য। শুধু তা-ই নয়, নিজের অনন্যতায় এরা এমন-ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে কারু সাধ্য নেই তাদের স্থানচ্যুত করে। কেননা,

> পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারও সঙ্গে কারও মিল হয় না, যেমন তোমার দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীক্ষার ছাঁচ তিনি ভেঙে ফেলেন। সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে মিল হয়, অসাধারণ পাগলের মিল হয় না।
>
> —পান্নালাল / গল্পসল্প

ধরা যাক মুনশিজির কথাই :

> তিনি বুঝি পাগল ছিলেন ?
> হ্যাঁ, যেমন পাগল আমি।
> তুমি আবার পাগল ? কী-যে বলো তার ঠিক নেই।
> তাঁর পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল।
> কী রকম শুনি।
> যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি।
> তুমি যা বলো সে তো সত্যি কথা। কিন্তু তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে।
> দ্যাখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে। বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম বোধ করে। দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই। মুনশি ছিলেন সেই জাতের মানুষ।
>
> — মুনশি / গল্পসল্প

এই রকম বাচস্পতি, হ. চ. হ., নীলমণিবাবু ও আরো কয়েকজন। বাচস্পতির 'বুগবুলবুলি' ভাষার ইংরেজি তর্জমা—সেই তর্জমাও বা কী অসামান্য (দি হাব্বারফ্লুয়াস ইন্‌ফ্যাচুফ্লুয়েশন অব আকবর ডর্বেগুিক্যালি ল্যাসেরটাইজড্ দি গর্ব্যাণ্ডিজম্ অফ হুমায়ুন)—

> শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন ; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্‌কায়িত। হেড পেডেণ্ডোর টিকির চারধারে ভেরেগুম্ লেগে লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন, ছেলেগুলোর উজবুম্মুখো ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব

ফিরিচুঙ্কুসের একেবারে চিক্‌চাকস্‌ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

— বাচস্পতি / গল্পসল্প

ইংরেজি তর্জমা আর তা শোনাবার প্রতিক্রিয়া যে-ভাষায় রচিত, তার মানে বোঝাতে কোনো মার্টিন গার্ডনার[৩] দরকার হয় না, শোনবামাত্র অর্থ ও অনর্থ টের পাওয়া যায়। বোতাম-আঁটা জামার তলায় এইসব অসামান্য লোক কোথায় লুকিয়ে থাকে, তা জানতে হ'লে পুপুদিদির সেই অসাধারণ দাদামশাই হওয়া চাই, যিনি অনায়াসেই শিল্পের টীকা-টিপ্পনী ঢুকিয়ে দেন নিজের লেখায়, খুলে বলেন সুন্দর কী, কবিতা কাকে বলে, সত্য আর তথ্যে তফাৎ কতটুকু, সুন্দরের আরাধনা কীভাবে করতে হয়, কল্পনা কী এবং কেন ইত্যাদি। সোজাসুজিই বলেন অনেক সময়ে, কিন্তু তবু যে এ-সব লেখা দার্শনিক সন্দর্ভ বা শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ হ'য়ে ওঠেনি, তার কারণই হ'লো প্রথমত ও প্রধানত তিনি ছিলেন কবি— শুধুই কবি— তাই তাঁর সব কথকতায় মধ্যেও কবিতাই আলো ফেলে দেয়, সব উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। 'গল্পসল্প'র 'রাজার বাড়ি', 'বড়ো খবর', 'পরী', 'আরো-সত্য'— এ-সব সাধারণ অর্থে রূপকথা নয়, নেই পরি কি বামন কি ডাইনি, নেই রাজপুত্তুর কি রাজকন্যা, কোনো ঘটনাও নেই এমনকি। অথচ বাঁধুনি তবু আঁটো, বাণীসিদ্ধির কুহক তবু মোটেই কম নয়, আর ধীরে-ধীরে তিনি উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন অকুতোভয়ে, বক্তব্য তুলে ধরেন নিঃসংকোচ।

চট ক'রে পাতা উলটে হুড়মুড় ক'রে চ'লে গেলাম, এ-সব রচনা মোটেই সে-রকম নয়। বরং ধীরে-সুস্থে সময় দিয়ে-দিয়ে চেখে-চেখে পড়বার ; সব মজা সব কৌতুক আস্তে-আস্তে মিলে-মিশে তৈরি ক'রে দেয় এক কল্পনার জগৎ ; আমরা হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে বসি যে আমরা এতক্ষণ কবিতা ও শিল্প বিষয়েই কথাবার্তা শুনছিলাম।

শ্রী বুদ্ধদেব বসু একবার বলেছিলেন, '"গল্পসল্প"র সম্পূর্ণ রস তাঁরাই শুধু পাবেন, যাঁরা নিজেরা সাহিত্যিক।' এই কথাটাকে অবলম্বন ক'রে আমরা আরো এগিয়ে গিয়ে বলতে পারি যে, 'গল্পসল্প'র সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এইখানেই যে, সে

৩ মার্টিন গার্ডনার গণিতের মানুষ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কেতাব ও পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কিন্তু তাঁর দুটি চমৎকার বই হচ্ছে লুইস ক্যারলের সটীক ভাষ্য : *Annotated Alice* আর *Annotated Snark* : যাকে বলে 'tour de force', এ-দুটি বই সত্যি তাই।

তার সব পাঠকদেরও সাহিত্যিক ক'রে তোলে, সহযাত্রী ক'রে তোলে। দাদামশাইয়ের সঙ্গে-সঙ্গে কেন পুপুদিদিও আস্তে-আস্তে কল্পনায় ও রচনায় অংশ নিতে শুরু করে, তা আমরা ক্রমেই বুঝতে পারি। কোনো যুক্তি বা মীমাংসার কথা নেই, স্পষ্টভাবে কোনো নিয়মও বাঁধা হয় না; দিনে-দিনে এই বিশ্বজগৎ তার সব সংগতি-অসংগতি, বিরোধ-মিলন নানা বিচিত্র উপাদান নিয়ে যেভাবে তাঁর চেতনার উপর আঘাত করেছে, তারই আলোছায়া খেলা ক'রে গেছে লেখার মধ্যে। কলের মধ্যে কাঁচা ভাবনাগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে হাতল ঘুরিয়ে আস্ত ও প্রস্তুত জিনিশ যেভাবে বার ক'রে নেয়া হয়, তাঁর এ-সব লেখা মোটেই তেমন নয়। আলাপ করতে-করতে এগোনো, কথার পিঠে কথা সাজানো; যে-সব উপকরণ ও উপচার নানা সময়ে তাঁকে এলোমেলো টান দিয়েছে সেই অসংলগ্ন মুহূর্তগুলো শুদ্ধু লেখায় উপস্থিত—কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক অখণ্ড ও সত্যতর বোধের সাহায্যে সব সংশ্লিষ্ট হ'য়ে যায়, হ'য়ে ওঠে তাৎপর্যমণ্ডিত ও উদ্দেশ্যময়—কথার খেলাও তখন আর কেবলমাত্র খেলা থাকে না—আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গে তার ভিতরে নেচে ওঠে অর্থ ও সিদ্ধি।

৫

'ব্যাকরণ মানি না' সঙিনতোলা বন্ধনীর ভিতর জোরগলায় এই কথাটি ঘোষণা ক'রে তবেই অসম্ভবের ছন্দটি ধরতে পেরেছিলেন সুকুমার রায়। যত রাজ্যের আজগবি আর উদ্ভট যে শেষ পর্যন্ত সেই খেয়ালি জগৎটির সন্ধান দিয়ে গেলো, যেখানকার সব ডিগবাজি আবোলতাবোল আর উলটো চালের মধ্যে এই বিদ্রোহী নির্ঘোষটিই বারে-বারে শোনা যায়, 'ব্যাকরণ মানি না'। স্বপ্নময় দোলা নিয়ে যাকে আবির্ভূত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি, খেয়ালখোলা হ'লেও শিল্পী হিশেবে সে অত্যন্ত সচেতন—একই সঙ্গে সে কবি, বিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক, হাস্যরসিক, এবং সর্বোপরি, বিদ্রোহী। আর এই স্বপ্নময় দোলাটি কিন্তু মোটেই ব্যঞ্জনাহীন নয়—স্বপ্নের ঝাপশা নীল কুয়াশাই সব উদ্ভট অদ্ভুত এলোমেলোর মধ্যে 'অসম্ভবের ছন্দ' জাগিয়ে দিলো। 'অসম্ভবের ছন্দ' কথাটি একদিক থেকে চাবিকাঠির কাজ করতে পারে এখানে। ওই ছন্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক বলীয়ান আদেশ, অপরিসীম জাদু, যার পরাক্রান্ত প্রভাব সিসেমদের পক্ষে অমান্য

করা অসম্ভব—ওই ছন্দই মন্ত্রের মতো খুলে দেয় সব রুদ্ধদ্বার, আমরা এক উলটোপালটা জগতে প্রবেশ করি। যতিঃপাতের সুনিয়মিত শৃঙ্খলাই যদি ছন্দ হ'য়ে থাকে, যদি 'প্রাণপদার্থের স্পন্দনের মধ্যে নৃত্যপর স্তব্ধতার লুক্কায়িত আবেশ'ই হয় ছন্দের দোলা, তাহ'লে মানতেই হয় যে সুকুমার রায় কোনো বিশৃঙ্খল ভুবনের কথা বলেননি—তাঁর খেয়ালি জগৎও কড়া আইনের অধীন, সেখানেও আছে অমোঘ নিয়ম, প্রচণ্ড বাধ্যতা, বিশস্তর সংহিতা—কিন্তু সব নিয়মকানুনই সেখানে ওলটানো এক ন্যায়শাস্ত্রের অধীন; শুধু তা-ই নয়, তাঁর পরিকল্পিত সব এলোমেলো, বেয়াড়াবেচাল আর কিম্ভূতের মধ্যেও কোথাও যেন এই চেনাশোনা বাধ্য জগতের কোণগুলি লুকিয়ে আছে। তাঁর ওই উলটো জগতে আমাদের পৃথিবীর কোনো ছায়াই যদি না-পড়ে—হ'তে পারে সে-ছায়া ডিগবাজিখাওয়া—অসম্ভবের ছন্দ তাহ'লে অমন তীব্র অভিঘাতে ভ'রে যাবে কেন?

যেভাবে মামুলি তর্কশাস্ত্র আর শাবেকি ব্যাকরণ-বিধি তাঁর আবোল-তাবোলের তোড়ে নাকানিচোবানি খেয়ে একেবারে নাজেহাল হ'য়ে যায়, আসল মজাটা লুকিয়ে থাকে তার ভিতরেই। আজগবি, কিন্তু কাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে, কোন সে বস্তু ওভাবে উলটে গিয়ে কুপোকাৎ হ'লো, তা আমাদের অজানা থাকে না—আর ব্যঙ্গের যে-লক্ষ্য তার প্রতিও কোনো রাগ অন্তত চোখে পড়ে না। যেটাকে যে-রকম ব'লে সবাই জানে, তাকে যে কেবল অন্য রকম ক'রে দিয়েই শেষ হ'লো, তা নয়—মনস্তত্ত্ব, চরিত্রসৃষ্টি, ঠাট্টা এমনকি বিশুদ্ধ 'খেয়াল রস,' এদের সম্মিলিত প্রভাবেই রচনাটি তীক্ষ্ণ, অফুরন্ত ও লক্ষ্যভেদী হ'য়ে ওঠে। না-হ'লে, কোনো নিয়মকানুনের বালাই না-রেখে, কোনো-কিছু উলটে দেয়া অতি সহজ কাজ—আর সেখানে হাস্যরসের পিছনে কোনো গভীর অর্থ থাকে না, বরং তা কেমন বোকা-বোকা দেখায়। 'যদি বলো লাটসাহেব কলুর ব্যাবসা ধ'রে বাগবাজারে শুঁটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের', রবীন্দ্রনাথের 'সে' এই কথা মিথ্যে বলেনি। আসলে, 'অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো'।

রবীন্দ্রনাথ যাকে কারিগরি বলছেন, সে-ব্যাপারটা সত্যি ভেবে দেখার মতো। 'ননসেন্স লেখার মধ্যে কোথাও না কোথাও সেন্স থাকতেই হবে', ওই কারিগরি কথাটার মানে দাঁড়ায় এই। সেইজন্যেই সব হাতে ননসেন্স বা

খেয়াল রসের রচনা উতরোয় না, তার জন্তে কবি হ'তে হয়। কবিদের মতো আর কে-ই বা পারেন ভিন্ন-ভিন্ন জিনিশের মধ্যে সাধর্ম্য আর বৈসাদৃশ্যের স্বরূপকে স্পর্শ করতে? কবিরাই কেবল সেতু বেঁধে দিতে পারেন সব বিপরীত আর বিসদৃশের ভিতর—অভিজ্ঞতা ও চিন্তাকে ছেঁকে বাস্তব অবাস্তব নানা জিনিশের মধ্যে প্রেরণাময় যোগসাজশ ঘটিয়ে তবেই সত্যিকার দ্রষ্টা হ'য়ে ওঠেন। হাঁস আর শজারু, বক আর কচ্ছপ, হাতি আর তিমি এদের মধ্যেই কেবল যোগসাজশ সম্ভব, কেননা একটির শেষ বর্ণে অন্যটির প্রথম বর্ণের ধ্বনি বেজে ওঠে; যা হয় না, তাকে বানাতে গেলেও ধীরে-ধীরে উলটো যুক্তি তৈরি ক'রে-ক'রে এগোতে হয়, যার ফলে শেষ অবধি মিলে যায় খাদ্য ও খাদক, সিংহ ও হরিণ: হরিণের নিরামিষভোজন শেষ হয়, সিংহের শিং নেই এই কষ্ট ঘুচে যায়। হাতি ও তিমির মিলতে বাধা নেই, বাধা নেই মিলে-মিশে তৃতীয়-কিছু হ'তে, কিন্তু সাপ-বাঘ ককখনো মিলবে না—তাদের মিশোল থেকে কোনো অসম্ভব জন্তুরই ধ্বনিভিত্তিক উদ্ভব সম্ভব নয়। এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্পের ডক্টর মোরো বহুরকম ব্যবচ্ছেদ করতে পারেন, অনেক জন্তুর মিশোল দিয়ে নতুন জন্তু তৈরি করতে পারেন, কিন্তু সাপ-বাঘকে মেলানো তাঁর বিবিধার্থসাধক ছুরি-কাঁচি-আঠার পক্ষেও সম্ভব কিনা সন্দেহ। সুকুমার রায়ের সব অসম্ভবই কোনো সম্ভব নিয়মের অধীন ব'লেই তাতে এমন দেদার মজা। বাংলা ক্রিয়াপদের আশ্চর্য ও উদ্ভট ব্যবহার দেখে যদি কোনো শব্দকল্পদ্রুমের কথা মাথায় আসে, অহংকার শব্দের চালচলন আর ক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্বন্ধ যদি কারু মাথায় তালগোল পাকিয়ে দেয়, তবে তাকে খ্যাপা বা অশিক্ষিত বলবো না—দেখবো যে সে-ই সত্যি শব্দ নিয়ে ভাবছিলো। চিন্তা, অভিজ্ঞতা আর নিয়মের ভিতরকার সব কোণগুলির টানাপোড়েন থেকেই তৈরি হ'য়ে গেছে অনিয়মের নিয়ম। শব্দের শাদা মানেটিকে ধ্বনির ও অভিজ্ঞতার দোলা লাগিয়ে চেহারাবদল করাবার জাদুবিদ্যা জানতে হয় তার জন্য। হৃদয়, ধিক্কার আর হিক্কা মিলিয়ে তৈরি হ'লো হিদ্‌হিদ্‌হিদিক্কার; তিড়িং-তিড়িং লাফ আর আতঙ্ক মিশিয়ে তৈরি হ'লো তিড়িতঙ্ক; এই মিশোল করার পদ্ধতি তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব জীবন, ধ্বনিতত্ত্ব ও অভিধানের সঙ্গে যাঁর পরিচয় দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ। ব্যর্থ প্রেমিকের আত্মধিক্কার আর নাকি কান্নার হেঁচকি—এ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, শব্দের কান, আর কল্পনার তুখোড় ক্ষমতা থাকলেই হিদ্‌হিদ্‌হিদিক্কারের মতো লাগসই শব্দ 'পেডেগোদের' গাম্ভীর্যকে

কলা দেখাতে পারে। এই বুগবুলবুলি ভাষার আইনকানুনগুলো অমোঘ ও অটুট – সেখানে কিন্তু কোনোরকম স্বেচ্ছাচারিতারই অবকাশ নেই। 'সে'-র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধারণাটিকে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। বুঝতে পারি, বাংলাদেশের পণ্ডিতপাঠকদের বুদ্ধির উপর তাঁর কোনো আস্থা ছিলো না ব'লেই রচনার ভিতরেই রচনাটিকে উপভোগ করার মালমশলা ও উপায়গুলি তিনি নিজেই জুগিয়ে দিয়েছিলেন। অতিথিকে জিরাফের মুড়িঘণ্ট আর শর্ষে-বাটা দিয়ে তিমিমাছ ভাজা খাওয়াবার বর্ণনার ভিতর স্থূলতা দেখেছিলো 'সে' – ও-রকম রচনা করা যে কত সহজ তা বুঝিয়ে দিয়েছিলো। তবু 'যা কিছুই জানিনে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শখ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না'। কিন্তু ওই বাড়াবাড়ির মধ্যে মজা আর কতটুকু। অদ্ভুত রসের গল্প জমে তখনি, যদি বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য ক'রে তোলা যায়। 'নেহাত বাজারে চলতি ছেলে ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি' কেবল অপযশেরই ভাণ্ডার হ'য়ে ওঠে।

অসম্ভাবনার গল্পেও সব খুঁটিনাটি যেন নিছক অলংকার ও শস্তা অত্যুক্তি না হ'য়ে ওঠে – ফাঁদা কাহিনী যে-সব তথ্যের উপর নির্ভরশীল, তাদের অমোঘভাবে সংশ্লিষ্ট হ'তেই হবে – কোনো অবান্তর প্রসঙ্গ থাকার জো নেই। আমাদের ক.ণ্ডজ্ঞান দিয়ে হয়তো সেই সম্বন্ধসূত্রটিকে আবিষ্কার করা যাবে না – সেইজন্যেই তো তা খেয়াল রসের গল্প ; কিন্তু যুক্তি তাতে থাকতেই হবে, হয়তো এমন যুক্তি যা সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না : লুকোনো, ওলটানো কিংবা পৃথক কোনো ধরনের যুক্তি। যেমন কাকতাল – কেতাবি তর্কশাস্ত্রে যাকে আমরা যুক্তি ব'লেই গণ্য করি না – কাক উড়ে গেলো, তাল পড়লো ধপাশ, এর মধ্যে সত্যি কোনো স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সুমাত্রাসূত্রের বন্ধন নেই ; অথচ কৌতুকের গল্প, অসম্ভাবনার গল্প অনেক সময়ে কাকতালকেই আঁকড়ে ধ'রে থাকে – সেখানেই থাকে সব মজা। সরলতায় ভরা, আদি কল্পনার মতো সরল ; তার মানে কিন্তু মোটেই 'সহজ' নয়। অতীব 'শিক্ষিত পটুত্বে'র দ্বারা এই সরলতা পরিকল্পিত ও বিরচিত – তাকে হ'তে হয় অত্যন্ত পরিশীলিত।

রবীন্দ্রনাথের 'সে' যখন জলে ডুবে বেঘোরে প্রাণ খোয়ালে, তখন মুচিখোলার বটগাছতলায় দেখতে পেলে তাদের পাতুখুড়ো গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র! 'সে' করলে কী, পাতুখুড়োর বেহুঁশ নির্জীব প্রাণপুরুষকে তাড়িয়ে সটান তার

শরীরের খাঁচার মধ্যে নিজের আত্মারাম চালান ক'রে দিলে : প্রাণ হারিয়ে 'সে' গাঁয়ে-গাঁয়ে একখানা গা খুঁজে বেড়িয়েছিলো, শেষকালে যে গেঁজেল পাতুখুড়োকে ও-অবস্থায় দেখতে পেলে সেটা নেহাৎই দৈবাৎ—গোটা গল্পে এবং আগে-পরে আর-কোথাও পাতুখুড়োর হদিশ মেলে না। কিন্তু আত্মার চোরাই-চালানের এই হো-হো কাহিনীটিতে গাঁজাখুরি শরীরটা না-থাকলে কিছুতেই মানাতো না : বলাই বাহুল্য, এখানে 'দৈবাৎ' ওই গাঁজাখুরি পাতুখুড়োর দেখা-পাওয়াটা—অর্থাৎ এই কাকতালটা—খুবই সচেতনভাবে তৈরি-করা। যে-কোনো দেহ পেলেই 'সে'-র চলতো না, এমনকি অন্যকোনো নেশামূর্ছিত লোক হ'লেও তার কাজ হাশিল হ'তো না—বাংলাভাষায় 'গাঁজা' কথাটার যে বিশেষ এক ব্যঞ্জনা আছে, তাকেই ভিৎ করেছে ব'লে গল্পটা অমনভাবে জিতে গিয়েছে। ওই ব্যঞ্জনাটিই ছিলো গোপন ও অমোঘ বিধান, যাতে এই একান্ত 'অস্বাভাবিক' ব্যাপারটিও যুক্তিময় ও অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে।

অর্থাৎ, কিছুই নেই অসম্ভাবনার চৌহদ্দির বাইরে—শুধু ওলটানো যুক্তিটিকে চিনতে পারা চাই, খুঁজে বার করা চাই। আর রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাই এই যুক্তির দ্বারা আত্মীয় ব'লে অমন তাৎপর্যময় হ'য়ে উঠেছে। 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে পিতা-পুত্রের বয়েসের ভেলকি ককখনো আমাদের সাংসারিক বুদ্ধিকে চড় কষায় না। কারণ অবলীলাক্রমে বয়েস উলটে যাবার পর তাদের ইচ্ছে ও ক্ষমতার বিপুল পার্থক্যটি যুক্তির টান দিয়ে আটকানো—আর সেইজন্যেই ওই গল্প ছেলেবুড়োর কাছে অমন কৌতুকের খনি। বয়েসের ওই ভেলকির পরেই চেনা পৃথিবীর যুক্তি কাজ ক'রে যায় আর দুই যুক্তির টানাপোড়েনে মুহুর্মুহু তৈরি হয় মজার পরিস্থিতি। কিন্তু তাঁর গোড়ার দিকের আষাঢ়ে গল্পগুলো যতটা সরল, স্নেহময়, পরিণামমধুর, শেষদিককার খেয়ালি রচনাগুলো কিন্তু তা নয়। সেখানে অনেক সময়েই দেখতে পাই রাগ, ক্ষোভ, নিষ্ঠুর ঠাট্টা—অবচৈতন্যের দুর্দমনীয় চীৎকার, মূর্ছার মধ্যকার তিক্ত অন্ধকার।

৬

সব অসম্ভাবনার মধ্যেই আমাদের পরিচিত সংসার থাকবে—হ'তে পারে ওলটানোভাবে, হ'তে পারে কিম্ভূতভাবে, কিন্তু তাকে থাকতেই হবে। অন্তত রবীন্দ্রনাথের সব খেয়ালি রচনার মধ্যেই ছিলো। সেইজন্যেই কখনও এই

আষাঢ়ে জগৎ একেবারে অচেনা ঠেকে না আমাদের। ঠাট্টার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাই চট ক'রে ধরা প'ড়ে যায়, বক্তব্যটি গোচরে আসে, সংসারের অনেক বিষয়ের নতুন তাৎপর্য আঁচ করা যায়। উপরে যে-ঢাকাটা চাপানো, তা আপাত চোখে বিশ্বাসের অতীত ব'লেই কৌতুক এমন লক্ষ্যভেদী। হঠাৎ দেখি ছন্দ, মিল কি বাণীভঙ্গির চমকপ্রদ বিন্যাসের মধ্যেই সব আবোলতাবোল বিশ্বাসযোগ্য ও তাৎপর্যময় হ'য়ে উঠছে।

কিন্তু তার জন্যেও চাই সচেতন ও সুচিন্তিত কারিগরি, চাই সুপরিকল্পিত শিল্পিতা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় কোনো বস্তুই বাস্তবের হুবহু নকল হ'তো না, কিন্তু হানাদার এক তাৎপর্যে প্রচণ্ড হ'য়ে উঠতো। তাঁর শেষ বয়েসের অসম্ভাবনা যে চিত্রকলার অনেক নিকটবর্তী, তা মূলত এইজন্যেই।

বস্তুত অসম্ভাবনার তাৎপর্যটি যদি উদ্দেশ্যময় না-হয়, তাহ'লে আক্ষরিক অর্থেই তার 'ননসেন্স' হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। 'সে'-র মধ্যে এই কথাটিই নানানভাবে তাঁকে বলতে হয়েছিলো। আর 'সে' তো আসলে এক-নামে ও এক-মলাটে দুই বই — শেষের অংশের নাম হ'তে পারতো 'সুকুমার'। সাংসারিক সুবুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার সংঘাত, 'সুকুমার'-কাহিনী কি তারই বিষণ্ণ প্রতিরূপ নয়? বাপ বলেছিলেন অর্থকরী পেশা শিখতে, সুকুমার বেরিয়ে পড়লো উড়োজাহাজের মাঝিগিরি শিখে চন্দ্রলোকের উদ্দেশে, অজানিতের সন্ধানে।

এমন-এক যুগ ছিলো — সুকুমার ছেলেবেলা থেকেই জানতো — যখন ইচ্ছে আর ঘটনা ছিলো এক — সে-যুগের নাম সত্যযুগ। মানুষের সব অসম্ভব ইচ্ছেগুলো তখন সংসারের মধ্যেই পূর্ণ হ'তো — তার জন্য সংসারের পরপারে কোনো ওলটানো যুক্তির জগতে যেতে হ'তো না। বাড়ির ছাতে ভাঙা ছাতার পক্ষিরাজে ক'রে তখন পেরোনো যেতো দূর-দুরান্তর। পথে তখন দুর্ঘটনার ভয় ছিলো না, ইচ্ছে করলেই ভাঙা ছাতার পক্ষিরাজে ক'রেই সব অসম্ভব জগতে যাওয়া যেতো। কিন্তু এখন সামান্য অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিতে গেলেও উড়োজাহাজ ভেঙে প'ড়ে যায়।

সেইজন্যই বোধহয় ছোটোরাই খেয়াল রসের লেখার সবচেয়ে ভালো সমঝদার — অন্তত রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই সেই ধারণা ছিলো — নইলে রবীন্দ্রনাথ খেয়ালি লেখার ছলে ছোটোদের সঙ্গে মন খুলে নানা বিষয়ে অমন অন্তরঙ্গ ও গভীর আলাপ করবেন কেন?

আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই — মনে হয়, যেন আমি অনেকবার দেখেছি, সে অনেকদিন আগে, কতদিন আগে তা মনে পড়ে না। বলব ? আমি দেখতে পাচ্ছি রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে — বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন, কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে — নদীর ধারে জোয়ারির খেত ; তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে সে কেবলই আসছে — তার পরে আখের খেত — সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে — রাতদিন একলাটি চলে আসছে ; খেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে — নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা ল্যাজ দুলিয়ে বেড়াচ্ছে — আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি, আমার বুকের ভিতর ভারি খুশি হয়ে-হয়ে উঠছে। — ডাকঘর : ৩ / অমলেরকথা

১

ব্যস্ত স্বর্গের মধ্যে যে-বেকার লোকটি গিয়ে পড়েছিলো, সে যা-ই করতো তার কোনো মানে থাকতো না--সে করতো সুন্দরের বন্দনা। কেজো মেয়েটির কাঁখের ঘড়ায় রঙে-রেখায় এঁকে দিতো ছবি, রঙিন সুতো বুনে-বুনে তৈরি ক'রে দিতো বেণী বাঁধবার দড়ি, অকারণেই তাকে ব্যস্ততার ভিতর দেরি করিয়ে দিতো। অকারণ—এই কথাটা খুবই দামি, কারণ পরে দেখতে পাওয়া গেলো, এই 'অকারণ'ই ক্রমে ফলিয়ে তুললো কান্না আর গান—কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড়ো-বড়ো ফাঁক পড়তে লাগলো। স্বর্গ থেকে ফেরৎ চ'লে এলো সে পৃথিবীতে—যেন প্লাতো-পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে খেদিয়ে দেয়া হ'লো শিল্পী ও কবিকে। কিন্তু সেই সঙ্গে কেজো মেয়েটিও আর ব্যস্ত স্বর্গে থাকতে চাইলে না, বললে, 'আমিও যাবো সঙ্গে।'

রবীন্দ্রনাথের যে-সব লেখা ছোটোদেরও ভালো লাগে, তাদের অনেকেরই বিষয় হ'লো প্রেম, শিল্প, আর 'অকারণ'। কোনো মানে নেই ; সরল, নিঃসংকোচ ও অকুতোভয় ; তর্কাতীত। কিন্তু ভাগ্যিশ সেই ব্যস্ত স্বর্গে ভুল ক'রে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো—ভাগ্যিশ তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো পৃথিবীতে। সে যদি পৃথিবীতে না-আসতো তাহ'লে কে আমাদের চেনাতো ধুলোমাটি গাছপালা হাওয়া আকাশ আর গান ?

দীর্ঘ সত্তর বছর ধ'রে, উনিশ শতকের শেষ থেকে, রবীন্দ্রনাথই চেনাবার চেষ্টা ক'রে আসছিলেন। দীর্ঘ সত্তর বছর ধ'রে স্বপ্নভঙ্গ আর দৃষ্টিদান—সেই দৃষ্টি, যাতে সব সত্যি ক'রে চেনা যায় ; সেই দৃষ্টি, যাতে ছদ্মবেশের আড়াল ঘুচে যায়। 'পরির পরিচয়'-এ রাজপুত্র চিনতে পেরেছিলো যখন বনের কালো মেয়ে চ'লে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো যে সে পরি। বিচ্ছেদে ও ভালোবাসায়,

দুঃখে ও স্মৃতিতে অভিভূত সেই মুহূর্ত, যখন রাজপুত্রের চোখ খুলে গেলো। কিন্তু সত্যি-দেখা মিথ্যে-দেখার এই রূপক রবীন্দ্রনাথে পৌনঃপুনিক, অবিরাম। সেই জন্যেই সমস্ত রবীন্দ্রনাথ মগ্ন হ'য়ে আছে বিষাদের স্তবে, দুঃখের স্তুতিগানে। বিষাদ, আর অকারণ অনির্দেশ্য কোনো টান—এ-ই হ'লো সর্বস্ব। পরিস্থান যদি কেউ পেতে চায় তাহ'লে তাকে প্রেমিক হ'তে হবে—নয়তো ভাবুক। কিন্তু এই দুই আসলে হয়তো বিচ্ছিন্ন বা অসংলগ্ন কিছু নয়, পরস্পরেরই সম্পূরক—কিংবা রবীন্দ্রনাথের অভিধানে প্রেমিক আর ভাবুক হয়তো সমার্থক। অন্তত এদের মধ্যে বিনিময় ও সংমিশ্রণ সহজ, সচকিত আর অবিশ্রান্ত। ভালোবাসা আর ধ্যান—এই দুই মুগ্ধ বোধ; এদের সুরেই বাঁশি বেজে ওঠে জলে-স্থলে আর সাগরজলে দুলে ওঠে অতল রোদন।

বাহুল্য হবে, যদি বলি যে এই বোধটি রবীন্দ্রনাথের সব রচনাতেই অন্তঃশীল-ভাবে কাজ ক'রে গেছে। আর, প্রেমিক কোনো-একজন থাকলেই তার সঙ্গে বন্ধুতা গ'ড়ে ওঠে ভাবুকের—যেন চেষ্টা চলেছে ভিতরকার সুমাত্রাসূত্রটি আবিষ্কারের। রাজপুত্র আর নবীন পাগলা, অমল আর ঠাকুর্দা, অভিজিৎ আর ধনঞ্জয় বৈরাগী—এইমতো অনেক আত্মীয়তাসম্বন্ধই আমাদের মনে প'ড়ে যায়; আর এরা যে যুগলে আসে, তার মানেই হ'লো এদের কেউই একা সম্পূর্ণ নয়, পরস্পরের সঙ্গে ভাব হ'লেই কেবল দু'জনে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। আরো যেন কতগুলো অনুচিন্তা এরই সঙ্গে জড়ানো: অমলকে দত্তক নিয়ে-ছিলেন মাধব দত্ত, অভিজিৎ ঝরনাতলায় কুড়িয়ে-পাওয়া—যেন এরা সকলেই প্রক্ষিপ্ত, যেখানে তারা আছে সেখানে যেন তারা কিছুতেই তারা পুরো মাপে আঁটে না, সেইজন্যেই যেন দূরের ডাকে সাড়া দেবার জন্য তারা অমন উন্মুখ ও উৎসুক।

এই সমাপতন যদি একবার হ'তো, তবে তাকে ভাবা যেতো কাকতাল, ভাবা যেতো আকস্মিক। কিন্তু বহুলতার দ্বারাই এই যোগাযোগগুলি সচেতন অভিপ্রায়ের দিকে ইঙ্গিত ক'রে যায়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পবীক্ষার মৌলিক দিক-গুলি এই সচেতন ও উদ্দেশ্যময় সম্পর্ক থেকেই সৃষ্ট হয়েছিলো।

কল্পনা ও বাস্তব—এই দুই জগতে বাস্তবিক কোনো সংঘাত বা সংঘর্ষ নেই তাঁর পরিকল্পনায়। শুধু গোপন যোগাযোগগুলি জানতে পেলেই হ'লো। যুক্তি দিয়ে জানা নয়, অনেক সময়ে ব্যাবহারিক কাণ্ডজ্ঞান তাকে জানতেও পায় না;

উপলব্ধির উপায় : স্পর্শাতুর সংবেদনা, সামগ্রিক বোধ। অনুভূতি দিয়ে, শিহরন দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে বুঝতে হয়।

এমনিতে আমাদের কাছে পরির দেশ মনে হয় তাকেই, যা মন-গড়া, অলীক-হলুদ, মিথ্যে-কোনো ভূমণ্ডল। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই 'নেই-দেশ' সব-পেয়েছির-দেশ হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। এ হ'লো সেই অসম্ভাবনার জগৎ যেখানে অ্যালিস, পিটার প্যান, পিনোচ্চিয়ো, নিল্স, জলকন্যাদের ছোটোবোন, পাহাড়গুলির কুঁকড়ো ও এইমতো আরো অনেকে বাস করে, যেখানে জন্মেছে এমন-এক তালগাছ ইচ্ছেকে পাখনার মতো মেলে দিয়ে যে উড়ে যেতে চায় ; সেখানে ফুল হ'য়ে যায় প্রজাপতি ; প্রদীপের আলো, জোনাকি ; পুকুরের জল, মেঘ ; সেখানে মেঘলা দিনে নদীর তীরে এসে লাগে সোনার নৌকো — সব ধান বোঝাই ক'রে নিয়ে যে চ'লে যায় ; সেখানে প্রদীপ ভেসে যায় অকারণে ; সেখানে আঁধার রাতের রাজা ঝড় বাজাতে-বাজাতে এসে হাজির হন ; কখনো সেখানে সোনার রথ থেকে অপ্রত্যাশিত নেমে হাত পেতে দাঁড়ান রাজাধিরাজ, আবার কখনো বুকের মালা ছিঁড়ে দিলেও দৃকপাত না-ক'রে রথের চাকায় তা গুঁড়িয়ে দিয়ে চ'লে যান রাজার দুলাল। সেখানে, ছাদের পাশে যেখানে তুলসি গাছের টব আছে সেখানেই, গ'ড়ে ওঠে মস্ত রাজার বাড়ি, আর তার পাশেই দিগন্তর ছুঁয়ে থাকে তেপান্তর মাঠ, ভাঙা ছাতার পক্ষিরাজে ক'রে একদিন যার উপর দিয়ে উড়ে যাবে রাজপুত্তুর।

২

এই নেই-দেশও সত্যি হ'য়ে ওঠে, যদি মন্ত্রটা জেনে নিতে পারা যায়।

ইরু বলেছিলো মন্তর না-জানলে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। আর ওই মন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো সরল একটি সত্যি-মন, অবিশ্বাস যার উপর তখনো হানা দেয়নি। বিশ্বাস করতে পারে ব'লেই ছোটোদের কাছে খেলনা পুতুলগুলো জ্যান্ত, বিশ্বাস করে ব'লেই কানাই মাস্টার পড়াতে পারে এমনকি কাঠের রেলিঙগুলোকেও, বিশ্বাস করে ব'লেই ছোটোদের কাছে সবকিছুই সঞ্জীবিত, উদ্দীপিত, কোনোকিছুই তাদের কাছে তুচ্ছ নয় — সামান্য নুড়িপাথর খোলামকুচিও তাদের কাছে মূল্যবান। ছোটোদের মতো ঘোরতর

পৌত্তলিকেরাই তুচ্ছতমের ভিতরে আবিষ্কার করতে পারে অনন্ত মহিমা; তারাই পারে ছোট্ট কাগজের নৌকোয় ক'রে সমুদ্র পাড়ি দিতে; পাশের বাড়ির বন্ধু মেয়েটির মধ্যে খুঁজে পায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের রাজকন্যাকে।

আর তা পারে ব'লেই আমরা এক সময়ে লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের শিশুসেব্য সাহিত্যের নায়ক এক ভাবুক শিশু, এক জাদুকর শিশু—অফুরান ইচ্ছা আর অভিলাষের চঞ্চলতায় যে দূরকে সাড়া দিয়ে ওঠে, ছেলেবেলায় যার কাছে দূরের ডাক পাঠিয়ে যেতো সবুজ পুকুর, পুরোনো বট, জোড়াসাঁকোর মস্ত বাড়ির গণ্ডিটানা ছাদ, আর বাতিল একখানা পালকি :

পাল্কিখানা ঠাকুরমাদের আমলের। খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাঁদের। ডাণ্ডা দুটো আট আটজন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাত-কাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পালকির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে, দাগ ধরেছে যেখানে-সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন এ কালের নাম-কাটা আসবাব, পড়ে আছে খাতাঞ্চিখানার বারান্দায় এক কোণে। আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না; আর ঐ পুরানো পাল্কিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই জন্যই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল। ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন্ ক্রুশো, বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে বসে আছি।[১]

ভিতু, বোকা, সরল একটি বন্দী বালক ব'সে আছে, দূরের থেকে তাকিয়ে আছে সেই ছুটির-দিনের-সবুজ-দ্বীপের দিকে, আর সব হৈ-চৈ ভিড়ের মধ্যেও যে একা-একা বানিয়ে নিচ্ছে অলীক এক দেশ, এই পৃথিবীতে কোনো বাস্তব অস্তিত্ব না-থাকলেও তার কাছে যা প্রচণ্ড- ও ব্যাকুল- ভাবে সত্যি :

তখন আমাদের বাড়ি-ভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই; নানা মহলের চাকর-দাসীর নানা দিকে হৈ হৈ ডাক।
সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা কাঁখে বাজার করে নিয়ে আসছে তরি-তরকারি, দুখন বেহারা বাঁখ কাঁধে গঙ্গার জল আনছে; বাড়ির ভিতরে

১ ছেলেবেলা / ২ : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১০ : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃ ১৩২-১৩৩

চলেছে তাঁতিনি নতুন-ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে; মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে হাঁপর ফোঁস্ ফোঁস্ করে বাড়ির ফর্মাশ খাটত সে আসছে খাতাঞ্চিখানায় কানে-পালকের-কলম-গোঁজা কৈলাস মুখুয্যের কাছে, পাওনার দাবি জানাতে; উঠোনে বসে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে। চটাচট্ শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিখিরির দল বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা করে।
বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে ওঠে; পাল্কির ভিতরকার দিনটা ঘণ্টার হিসাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজত— রাজা যেতেন স্নানে চন্দনের জলে।[২]

মূল সূত্রটি অতি সহজভাবে অসংকোচে চট ক'রে ব'লে ফেলা হ'লো: 'পাল্কির ভিতরকার দিনটা ঘণ্টার হিসাব মানে না'। প্রতিদিনের আটপৌরে আঁটোশাটো চেনাশোনা নিয়মকানুন সব বাতিল ক'রে দেয়া হ'লো মুহূর্তে— আর তক্ষুনি জেগে উঠলো কল্পনার জগৎ, অলৌকিক বিশ্ব, যার সন্ধান জানেন কেবল কবিরা:

ছুটির দিন দুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে। একলা বসে আছি।[৩]

তার পরেই এই বাস্তব দিনটার দেউড়ির মধ্যে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো স্বপ্নে-পাওয়া এক জগৎ:

আমি একলা,
এইটুকু সীমানার অসীমে আমি একেশ্বর।
মনে মনে চলেছে সেই পালকি—
বাহক নেই, পথ নেই
দিনরাতের চিহ্ন-হীন অবকাশে।
বালকের ইচ্ছাভ্রমণের বাহন ঐ পালকি,
ও তার গল্পের জগতের অচল গতির পক্ষিরাজ।[৪]

২ ছেলেবেলা / ২ : রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ১০ : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃ ১৩৩
৩ তদেব : পৃ ১৩৩
৪ পালকি / গ্রন্থপরিচয় : রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ২৬ : বিশ্বভারতী : পৃ ৬৫৬

কোথায় গিয়ে পৌঁছুলো সেই সংসার-থেকে-বাতিল পালকি, সেই 'অচল গতির পক্ষিরাজ'? কোনখানে তার অবিরাম চলা?

> চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পাল্কি, হাওয়ায়-তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলছে পাল্কি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে-সব দেশের বই-পড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনও বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে, গা করছে ছম্ ছম্। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম! ব্যাস্, সব চুপ। তারপরে এক সময়ে পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি; ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্। ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, 'সামাল, সামাল, ঝড় উঠল।[৫]

কিছু শোনা, কিছু না-শোনা; কিছু জানা কিছু অজানা দিয়ে ভরা এক রোমাঞ্চকর চরাচর গ'ড়ে উঠলো তারপর। গ'ড়ে উঠতে সে বাধ্য, তা তো স্পষ্ট: বশম্বদ ও অনুগত ভৃত্যের মতো কল্পনা যদি তাকে গ'ড়ে না-তোলে তো উপায় নেই, কেননা অফুরান ঝিমঝিমে দুপুর, স্পর্শভীরু ভাবুক বালক, আর একাকিত্ব—এরা সব মিলে-মিশে এক সময়ে টেনে নিয়ে আসে এই বানিয়ে-তোলা জগতে। এই স্বরচিত পৃথিবী যে বাস্তব নয়, এই বোধটাও সব সময়ে কাজ করে, কারণ আশপাশে সব সময়েই ঘুরে বেড়ায় অভিজ্ঞ, বিনষ্ট ও বয়স্করা —যারা কেবলই সন্দেহ আর অবিশ্বাস খুঁচিয়ে তোলে। যে-ছোট্ট ছেলেটি মস্ত ডাকাতদলের সঙ্গে একা লড়াই ক'রে মাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলো, তার জন্য সব সময়েই অপেক্ষা ক'রে থাকে সবজান্তা এক দাদা, সংগত প্রশ্নটি উত্থাপন না- ক'রে যে কিছুতেই ছাড়ে না: "দাদা বলত, 'কেমন করে হবে? / খোকার গায়ে এত কি জোর আছে?"[৬] ছোট্ট ছেলেটি উত্তরে কিন্তু একটি বিমর্ষ, হতাশ ও সরল উক্তির মধ্যে দিয়ে শিল্পের একটি সত্যকে তুলে ধ'রে যায়:

> রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—
> এমন কেন সত্য হয় না, আহা।

৫ ছেলেবেলা / ২: রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১০: জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ: পৃ ১৩৩
৬ বীরপুরুষ / শিশু: রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২: জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ: পৃ ২৮

ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে।[৭]

'ঘটে যা তা সব সত্য নয়,' এ-কথাটা সোজাসুজিই অন্যখানে আগে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'রোজ যা-কিছু ঘটে, তা সত্যি নয়, কেননা তা দিয়ে গল্প হয় না, কেননা ঘটনা বিশৃঙ্খল, শিল্প দাবি করে সম্বন্ধসূত্র, দাবি করে শৃঙ্খলা, দাবি করে অভিপ্রায়ের একমুখিনতা'—এই তত্ত্বকে নস্যাৎ করা যেতে পারে হয়তো অন্য-কোনো তত্ত্ব দিয়ে; কিন্তু মানতেই হয় যে শিল্পের সম্বন্ধে এটাও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত চিন্তাসূত্র—আর রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। বরং তাঁর যে-সব রচনা সরকারিভাবে সাহিত্য-আলোচনা ব'লে খ্যাত, তার ভিতর অনেক স্ববিরোধ লক্ষ করা গেলেও, ছোটোদের কাছে তিনি যখনই শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছেন, তখনই পৌনঃপুনিকভাবে এই কথাটি তিনি শুনিয়েছেন। কবির মনই একমাত্র সত্য, সেখানে যা ঘটবে তা-ই চিরকালের উদ্দেশে নিবেদিত, 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় নারদের এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তথ্য ও সত্য সংক্রান্ত বাদানুবাদের শেষ কথাটি ব'লে দিতে চেয়েছেন। ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়েই তিনি নতুন একটি কথার প্রবর্তন করেছিলেন: 'আরো-সত্য'। যে-কল্পলোকের নাম তিনি দিয়েছিলেন পরিস্থান, সেখানে আরো-সত্যেরই কারবার। সেই পরিস্থানে, সেই 'নেই-দেশে', সেই সব-পেয়েছির-দেশে, সব সময়েই সত্যযুগ চলেছে, যখন 'মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা'।[৮]

এই কথা শুনে ছোটো মেয়েটি তার দাদামশায়কে জিগেশ করলে, 'সেদিন তুমি যে আরো সত্যির কথা বলছিলে, সে কি কেবল পরিস্থানেই দেখা যায়।' উত্তরে:

আমি বললুম, তা নয় গো, এ পৃথিবীতেও তার অভাব নেই। তাকিয়ে দেখলেই হয়। তবে কিনা সেই দেখার চাউনি থাকা চাই।[৯]

৭ বীরপুরুষ / শিশু: রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২: জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ: পৃ ২৮
৮ সে: রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৬: বিশ্বভারতী: পৃ ২৮৮
৯ আরও-সত্য / গল্পসল্প: রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৬: বিশ্বভারতী: পৃ ৩৩৫

৩

সেই চাউনি, বলাই বাহুল্য, ভাবুকের আর প্রেমিকের। কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, কবির দৃষ্টিই আসলে 'সত্য দেখায়'—কেননা 'বাঁধা নামের বন্দীর শৃঙ্খল' কেটে দিতেই কবির দল ব্যস্ত—কোনো নামেই যাকে কোনোকালে কুলোয় না, তারই নামের ইশারা তাঁরা দেন ছন্দের ঝংকারে। সেই জন্যেই সবাই যাকে কুসমি ব'লে জানে, কবি জানেন যে সে পরিস্থানের পরি। স্বপ্নের পালে হাওয়া এসে লাগলেই আবার গ'ড়ে উঠবে সেই পরিস্থান, গ'ড়ে উঠবে তার পারিজাতের বন, প্রজাপতির পাখা, আর দিগন্তের ঘাটে এসে ঠেকবে শাদা মেঘের খেয়া নৌকো, একদিন যে-নৌকোয় ক'রে কুসমি পৃথিবীর ঘাটে এসে পৌঁছেছিলো।

সংক্রামক স্নেহেভরা সেই কল্পনা, যার ভিতর দিয়ে ছোট্ট মেয়েটি অনায়াসেই পরি হ'য়ে যায়। ভালোবাসার এই মাধুর্যই কবির হ'য়ে সব রচনা ক'রে দেয় —এই কথাটা বারে-বারে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতায়-গানে-গল্পে সবখানেই প্রেমের এই বোধটিকেই তিনি জাগিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই এ-কথা তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব :

> রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
> তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
> এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রঙ ওঠে জেগে,
> কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে—
> রাঙা খেলা যবে দেখি ও রাঙা হাতে।[১০]

কিংবা :

> সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। জানলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ল তোমার আসমানি রঙের শাড়ির উপরে। আমি সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, পরীস্থানের রাজা চর পাঠিয়েছে তাদের পলাতকা পরীর খবর নিতে। সে এসেছিল আমার জানলার কাছে, তার সাদা চাদরটা উড়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। চর দেখল তোমাকে আগাগোড়া, ভেবে পেল না তুমি তাদের সেই পালিয়ে-আসা পরী কি না। তুমি এই পৃথিবীর পরী ব'লে তার সন্দেহ হল। তোমাকে মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হবে

১০ কেন মধুর / শিশু : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২ : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃ ১৪

না। এত ভার সইবে না। ক্রমে চাঁদ উপরে উঠে গেল, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল, চর শিশুগাছের ছায়ায় মাথা নেড়ে চলে গেল। সেদিন আমি খবর পেলুম, তুমি পরীস্থানের পরী, পৃথিবীর মাটির ভারে বাঁধা পড়ে গেছ।[১১]

বাৎসল্যের এই বিপুল অন্তঃশীল স্রোত আমাদের শেষ পর্যন্ত নিয়ে 'জগৎ-পারাবারের তীরে', যেখানে 'শিশুর মহামেলা'। এই সত্যদৃষ্টির ফলেই অনেক বয়স্ক ও তীব্রগভীর বিষয় নিয়েও তিনি খোলাখুলি কথা বলতে পেরেছেন। নরনারীর মিলন-সম্বন্ধ ও জন্মরহস্যের ব্যাপার নিয়েও কথা বলতে তাঁর কোনো সংকোচ হয়নি। বাৎসল্য স্নেহ ও করুণা ওতপ্রোত মিশে থাকে আর সুদূরস্পর্শী অন্বেয় তাৎপর্যে ভ'রে দেয় ছন্দ-মিল ও কল্পনাকে। মনে রাখতে হবে, 'শিশু' কাব্যগ্রন্থটির একেবারে প্রথমে 'জন্মকথা' নামক কবিতাটিকে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু কি খোকা কোথা থেকে এলো, এই কথাটিই সেখানে বলা হয়েছে ? আরো-গভীর, আরো-তাৎপর্যময়, আরো-মহীয়ান এই কবিতাটি, যার রেশ অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের রক্তে-মাংসে পবিত্রের কল্যাণস্পর্শ ছড়িয়ে দিয়ে যায়। কী ক'রে সম্ভব হ'লো এই আশ্চর্য কবিতাটি ? অপাপবিদ্ধের দৃষ্টি ছিলো ব'লে ? অনুকম্পা ও বাৎসল্যের অফুরান নির্ঝর ছিলো ব'লে ? অলোকদৃষ্টির ভিতর আরো-সত্য কিছু ছিলো ব'লে ? না-হ'লে কী ক'রে সম্ভব হ'লো এই স্বচ্ছ দিব্যদৃষ্টি, যা একটি ছোট্ট ছেলের ভিতরেই অনায়াসে প্রত্যক্ষ ক'রে নিলো চিরকালকে ?

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালোবাসায়,
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরানে—
পুরানো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের 'পরে
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে ॥

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,

১১ পরী / গল্পসল্প : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৬ : বিশ্বভারতী : পৃ ৩৩৩

আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়েছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে ॥

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ-স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি ॥[১২]

পুরো কবিতাটি তুলে দেবার লোভ সংবরণ করা কী কঠিন লাগে, মনে হয় যেন স্নান অসম্পূর্ণ থেকে গেলো। 'তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে' বা 'এসেছিস আনন্দস্রোতে'— এইসবের ভিতরকার ছন্দের দোলাটুকু, উপলখণ্ডের উপর দিয়ে ব'য়ে-চলা ঝরনার মতো, এক অপরূপ গুঞ্জন তুলে দেয়— সেইজন্যেই অসম্ভব এর 'সারমর্ম' উদ্ধার করা— সেইজন্যেই এরা এমন বিশ্লেষণবিমুখ ও শুচিস্মিত। কবিতাগুলি এতই শুদ্ধ যে আর-কোনো পরিচয়ই তাদের সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারে না। মনে হয়, তাদের নিয়ে কিছু বলতে গেলেই সব পবিত্রতা হারিয়ে যাবে। এই অপাপী স্নিগ্ধতার তুলনায়, আবারও বলতে চাই, এমনকি ব্লেক-এর 'অপাপবিদ্ধের গান'ও অনেক অভিজ্ঞ, শিক্ষিত ও উদ্দেশ্যময়।

৪

আর এই করুণা ও শুচিতাই সৃষ্টি করেছে এক অনির্দেশ্য করুণ সুর— রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই ধারণা ছিলো বিষাদ ছাড়া কিছুই সুন্দর হয় না। সেইজন্যই 'সে' নামক আজগবি-ভরা খেয়ালখুশিও শেষ পর্যন্ত আকুল ও বিধুর হ'য়ে ওঠে। এই উদাস-করা সুরেরই প্রস্তুতি চলেছে সব হাসিখুশির মধ্যে। সব ঠাট্টা ও কৌতুকের ঝিকিমিকির আড়ালে রয়েছে স্নেহ আর অনুকম্পা, 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় যে-অনুকম্পা শেষ পর্যন্ত ক্ষীরোকেও চূড়ান্ত বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছিলো।

আমরা এটা আগে বলতে চেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ দৃষ্টির সামনে তাঁর শেষ

১২ জন্মকথা / শিশু : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২ : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃ ৫

বয়েসের রেখায়-লেখায় অনেক অশুভ ও অমঙ্গলবোধের চিহ্ন ছড়িয়ে পড়েছিলো —তার অনেকখানিই ছিলো অবচেতনার অবদান। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'ছড়া' বইয়ের ৭ নম্বর কবিতাটি যখন ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে বেরিয়েছিলো, তখন কবিতাটির মুখবন্ধ হিশেবে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে মনে করা যায় :

> অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না-পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।[১৩]

তখনকার নানা অবচৈতন্যের সৃষ্টির মধ্যে আছে সামাজিক পেষণযন্ত্রের নিষ্ঠুর চেহারা, কখনো আছে বোঁচা গোঁফের প্রচণ্ড ও মারাত্মক হুমকি, যা নামিয়ে দেয় ধ্বংসের দুর্ধর্ষ ও উন্মাদ ঢল, কামানের গোলায় ছারখার ক'রে দেয় ফুল-বাগান। তাঁর রোষের পরিমাণ সহজেই বোঝা যায় যখন মন্তব্য পড়ি : 'সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসেব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাৎ থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।' কিন্তু দাঁতখিঁচোনো অশুচি অপমানিত সভ্যতার পাশাপাশি তখনও তিনি নিঃসংকোচে রেখেছিলেন সেই আশ্চর্য কবিতাটি, মরণোত্তর 'চিত্রবিচিত্র' বইতে পুনর্মুদ্রণ-কালে যার নাম দেয়া হয়েছে 'পিয়ারি'।

> আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি
> খিড়কির আঙিনায়, নামটি পিয়ারি।
> আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি।
> সে কহিল চুপে চুপে, কিছু নাহি মাগি।
> আমি চাই ভালো ক'রে চিনে রাখো মোরে,
> আমার এ আলোটিতে মন লহো ভ'রে।[১৪]

কী হবে তার আলোয় মন ভ'রে নিলে ?

> আমি যে তোমার দ্বারে করি আসাযাওয়া,
> তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া।

১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অবচেতনার অবদান / 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ : পৃ ২৯৬

যখন ফুটিয়া ওঠে যূথী বনময়
আমার আঁচলে তারি আনি পরিচয়।
যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে
আমার পরশ পেলে খুশি হ'য়ে ওঠে।
শুকতারা ওঠে ভোরে, তুমি থাকো একা,
আমিই দেখাই তারে ঠিকমতো দেখা।[১৪]

অর্থাৎ তখন তাঁর মধ্যে তীব্র অমঙ্গলবোধের সংক্রাম হয়েছিলো সত্যি, তবু শেষ পর্যন্ত জগৎজোড়া উচ্ছল অভ্যর্থনাকেই তিনি বড়ো ক'রে দেখেছিলেন। তেমনি 'সে'-র মধ্যে আজগবি লোকটির নানা কাণ্ডকীর্তির আড়ালে পুপেদিদি ও সুকুমারের ভালোবাসার মান-অভিমান দিয়ে যে-গল্প গ'ড়ে ওঠে, তার উপর অনেক দূর থেকে ছায়া ফ্যালে এক ধূসর ও অস্পষ্ট গোধূলিবেলা, আর অনেক দূর থেকে কথা ভেসে আসে শুকসারীর। যেই শুকসারীর কথা শোনা গেলো, তখনই চাপা স্বরে এই কথাটি ব'লে দেয়া হ'লো সুকুমারদের বাড়ির ছাদে একদিন ভাঙা ছাতাটাকে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না আতশবাজির সেই আধপোড়া কাঠি। শুকসারীর এই তর্কটিই যেন এক অর্থে বইটির মূল বিষয়, যা বিভিন্ন উল্লেখ ও গুপ্তসংযোগের ভিতর দিয়ে একটি খেয়াল-রসের রচনাকে উদাস, বিধুর ও কাতর ক'রে দেয়।

শুক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে। শুক বলছে, যেখানে কোথাও ব'লে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে; তুমিও চলো আমার সঙ্গে। সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে; এখানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে ঝুমকো লতা, এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া করে ভালো লাগে তার মধু খেতে; এখানে রাত্তিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কামরাঙার ঝোপ, আর বাদলায় বৃষ্টি যখন ঝরতে থাকে তখন দুলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝর্ঝর্ শব্দ ক'রে — আর, আকাশে কীই বা আছে। শুক বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধে, আছে মাঝরাত্রের তারা, আছে দক্ষিনে হাওয়ার যাওয়া-আসা, আর আছে কিছুই না — কিছুই না — কিছুই না।
সুকুমার জিগেস করলে, কিছুই-না থাকে কী করে, দাদু।
সেই কথাই তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শুককে।
শুক কী বলছে।

১৪ রাজরানী / গল্পসল্প : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৬ : বিশ্বভারতী : পৃ ৩২৪-৩২৫

শুক বলছে, আকাশের সবচেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরই জন্যে আমার মন কেমন করে যখন বনের মধ্যে বাসা বাঁধি। ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনায়; মাঘের শেষে আমের বোলের নিমন্ত্রণ-চিঠিগুলি ঐ কিছুই-না'র ওড়না বেয়ে হুহু করে উড়ে আসে, মৌমাছিরা খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে। উৎসাহে সুকুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; বললে, আমার পক্ষীরাজকে ঐ কিছুই-না'র রাস্তা দিয়েই তো চালাতে হবে।[১৫]

এই সুকুমারই যে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কবি ছেলেটি, তা হয়তো স্পষ্ট ক'রে বলা অনাবশ্যক; কেননা সুকুমার যা-যা হ'তে চায়, আর ওই ছোট্ট কবিটি যা-যা হ'তে চেয়েছিলো, এই দুয়ের ভিতর মিল এত যে কখনো-কখনো মনে হয় যেন তার কথাই আবার নতুন ক'রে বলা হচ্ছে। সে-ই হ'লো 'শিশু ভোলানাথ', সেই হ'লো 'ডাকঘর'-এর অমল, কিংবা কোনো সাহসী হয়তো আরো এগিয়ে গিয়ে ব'লে দিতে পারেন যে 'এবং সে-ই হ'লো "ছেলেবেলা"র বন্দী বালক'। যেমন 'ছেলেবেলা'র সেই বন্দী বালকটিই উত্তরকালে ঘর ও বাহির, কুলায় ও কালপুরুষ, নীড় ও আকাশ, সীমা ও অসীম এইসব বিপরীতের মধ্যে অটুট এক যোগাযোগ আবিষ্কার করেছিলো, যুগপৎ অনুভব করেছিলো সুদূরের আহ্বান ও ধরণীর এক কোণে ছোট্ট একখানি বাসা বাঁধার উৎকাঙ্খা। কতবার সে কত রকমভাবে এই কথাটি বলেছে :

> আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
> দুই রকমের দুই খেলা,
> একটা সে ঐ আকাশ-ওড়া
> আরেকটা এই ভুঁই-খেলা।[১৬]

কখনো এই কথাটি বলতে গিয়ে স্বর হয়েছে চপল, চটুল—নুড়ির উপর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে-যাওয়া ঝরনা যেন। কখনো গলার স্বর ভারি, চাপা, উদাস, নিবিড়। স্বপ্নে কথা বলবার মতো ক'রে ব'লে উঠেছিলো সুকুমার, 'আমার ইচ্ছে করে শালগাছ হয়ে দেখতে'। আর এ-কথা শোনবামাত্র তক্ষুনি তার পক্ষ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক মহাকবি, বলেছিলেন :

১৫ সে : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৬ : বিশ্বভারতী : পৃ ২৬২-২৬৩
১৬ দুই আমি / শিশু ভোলানাথ : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২ : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃ ৬০৬

দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফুলে, ওর মজ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদৃশ্য প্রবাহ বহে যায় যাতে ঐ রূপের গন্ধের ভোজবাজি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছে করে বই কি! গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী ক'রে।[১৭]

তিনি যে সুকুমারের পক্ষ নিলেন, তার কারণ কি এই নয় যে, তার ইচ্ছের মধ্যে দিয়ে আদল ফুটে উঠেছিলো সেই ছোটো ছেলেটির, যে বলেছিলো

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি
ভোরের বেলা মা গো, ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিনতে আমায় পারো।[১৮]

এবং আরো :

মা, যদি তুই আকাশ হতিস,
আমি চাঁপার গাছ
তোর সাথে মোর বিনি-কথায়
হত কথার নাচ।

তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে-থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।[১৯]

কিন্তু সেই ছোটো ছেলেটি ও সুকুমার—দু'জনেই জানে এ-রকম আর হয় না, অসম্ভবের মালমশলা দিয়ে বানানো এই সৃষ্টিছাড়া ইচ্ছে এখন আর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। কিন্তু যখন যেমন হ'য়ে উঠতে ইচ্ছে করে, তা যদি না-ই হওয়া যায়, তবে সেই গভীর দুঃখকে চাপা দিয়ে রাখবে কোথায়? একদিন অবিশ্যি সত্যযুগ ছিলো, যখন মানুষ পুথি প'ড়ে শিখতো না, 'খবর শুনে জানত না,

১৭ সে : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৬ : বিশ্বভারতী : পৃ ২৮৯

১৮ লুকোচুরি / শিশু : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২ : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃ৪০

১৯ বাণী-বিনিময় / শিশু ভোলানাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২ : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃ ৬০৯

তাদের জানা ছিল হয়ে উঠে জানা'। কিন্তু সেই সত্যযুগ কি আর কখনও ফিরে আসবে না? সুকুমার জিগেশ করেছিলো :

> আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।
> যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর-কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।[২০]

সেই সত্যযুগ, বা তার পরিবর্ত, তবে শিল্প। কিংবা হয়তো বাল্যবেলাই, যখন ইচ্ছেমতো সব-কিছু হওয়া যেতো। আর সেই বাল্যবেলা যখন চ'লে যায়, তখনই আসে তাকে পুনরুদ্ধার করার পালা—রচনা করার, বানিয়ে তোলার, সৃষ্টি করার সময়; চ'লে গেলো ব'লেই পরিকে বানিয়ে নিতে পেরেছিলো রাজপুত্র : শৈশব হারিয়ে গেলো ব'লেই তা রূপান্তরিত হ'লো সব-পেয়েছির-দেশে, পরিস্থানে, অসম্ভবের কল্পলোকে। শৈশবের স্বর্গ ও সত্যযুগ থেকে পতন ঘটেছিলো রবীন্দ্রনাথের, সেই জন্যেই বারে-বারে তাঁকে বানাতে হ'লো, ভাবতে হ'লো বানিয়ে তোলার উপায় ও কলাকৌশল। 'স্বর্গের জন্য যে-বিরহবেদনা' 'গীতাঞ্জলি'কে থরোথরো ক'রে কাঁপিয়েছে, তা-ই, অন্য আরেকভাবে, তাঁর শিশুসেব্য সাহিত্যেরও প্রণোদনা। আসলে তাঁর শিশুসাহিত্য হ'লো তাঁর জীবন-ব্যাপী সাধনারই অন্য-আরেক রূপ; আর, সেইজন্যেই, অসীম মমতা ও তৃষ্ণায় বারে-বারে তিনি ফিরে আসতে চেয়েছেন শৈশবে, চেয়েছেন 'শিশু হবার ভরসা'। নিজের জন্যই এটা তাঁর দরকার ছিলো। 'শিশু ভোলানাথ' সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে নিজের এই প্রয়োজনের কথাটাই খুলে বলেছেন। আর নিজের জন্য সেই শৈশবস্বর্গ পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে আমাদেরও তিনি কৃপা করলেন, দিয়ে গেলেন তাঁর সব উপার্জন – ব'লে গেলেন মুক্তির উপায়, ব'লে গেলেন কীভাবে কল্পনার ভিতর দিয়ে বিশ্বের প্রাণ ও স্পন্দনকে নিজের রক্তের ভিতর অনুভব করা যায়।

আর তাই তাঁর কল্পলোক একেবারেই স্বরচিত। কেননা আগেকার রূপকথা বা খেয়ালখুশির সঙ্গে তাঁর রূপকথার বড়ো তফাৎই হ'লো এইখানে যে তিনি কিংখাবের জুতো বা সোনারুপোর কাঠিতে মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে অলৌকিকের কথা বলেননি, শুধু বলেছেন নিজের হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকাতে, সেখানেই আছে সেই রহস্যময় জাদুবিদ্যার কলকাঠি, যা প্রতিদিনের উপর থেকে ঢাকা তুলে দিতে

২০ সে : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৬ : বিশ্বভারতী : পৃ ২৯২

পারে। আর তাই তাঁর পরি, জাদুকর কি সুয়োরানীদের—সকলকেই আমরা প্রতিদিনের পথের ধুলোয় লুকিয়ে থাকতে দেখি, হয়তো ছদ্মবেশে, হয়তো অন্যরূপে, কিন্তু ক্রমে আমরা আস্তে-আস্তে জেনে ফেলি আড়াল ঘোচাবার উপায়, চিনতে শিখি তাদের ছবি ও কবিতা গান ও গল্পের 'বড়ো রাস্তায়' বেরিয়ে প'ড়ে, আর তখনই, তাঁর ছোটোদের প্রতি উদ্দিষ্ট ছবি ও কবিতা, গান ও গল্প, খেয়ালখুশি ও বিষাদগাথা, স্তব ও বিলাপ প'ড়ে, মনে হয় যেন প্রাণের পারাবারে স্নান ক'রে উঠলাম, যার তীরে চিরকাল ধ'রে 'ছেলেরা করে খেলা'।

—